১

ভূমিকা
Introduction

কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি, অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি ও যুক্তিবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হলেও সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলো কখনো কখনো বিভ্রান্তির জন্ম দিয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্য অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতিগুলো আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও সাধারণ জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করার বিধিমালা প্রদান করে, যৌক্তিক ও যথাযথ যুক্তিবিন্যাসের নিয়ম স্থাপন করে এবং আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের নিয়ম-নীতি প্রদান করে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে গবেষককে জানতে হবে যে, বিজ্ঞানের যুক্তি কি, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক বিজ্ঞানে অধিত সামাজিক আচরণের বিষয়গুলো গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না? বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে কতগুলো সুনির্দিষ্ট ও নিয়মবদ্ধ ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সেগুলো হলো গবেষণা সমস্যার নির্বাচন ও সূত্রবদ্ধকরণ, প্রত্যয়গুলোর কার্যকর সংজ্ঞায়ন ও অনুকল্প নির্মাণ, গবেষণা নক্শা প্রণয়ন, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ, উপাত্ত সংগ্রহ এবং উপাত্তের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিতে নৈতিক আচরণ বিধি অনুসরণের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, বা কোন অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে কি না, সেটি নিশ্চিত করা গবেষকের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আমরা এ বিষয়গুলোকে নিয়ে এই ইউনিটে আলোচনা করবো।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : গবেষণা পদ্ধতির যৌক্তিকতা - ১
- পাঠ - ২ : গবেষণা পদ্ধতির যৌক্তিকতা - ২
- পাঠ - ৩ : বিজ্ঞানের চর্চা
- পাঠ - ৪ : সামাজিক বিজ্ঞানের যুক্তি
- পাঠ - ৫ : বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য
- পাঠ - ৬ : গবেষণা প্রক্রিয়া
- পাঠ - ৭ : সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতা

পাঠ - ১

গবেষণা পদ্ধতির যৌক্তিকতা - ১
Logic of Research Methodology – 1

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- জ্ঞান অর্জনের উপায়
- অনুসন্ধানের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা
- নিজস্ব উদ্যোগে অনুসন্ধানের ভ্রান্তি

জ্ঞান অর্জনের উপায় (Approaches to Knowledge)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া আরো তিনটি পদ্ধতিতে মানুষ জ্ঞান অর্জন করেছে। সে পদ্ধতিগুলো হলো, কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি, অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি।

আমাদের মনে হতে পারে যে, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ এবং নিজের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া আরো তিনটি পদ্ধতিতে মানুষ জ্ঞান অর্জন করেছে। সে পদ্ধতিগুলো হলো, কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি (authoritarian mode), অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি (mystical mode) এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি (rationalistic mode)। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী তিনটি প্রধান বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হলো, কিভাবে জ্ঞানের উৎস বা জ্ঞান উৎপাদনকারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে? অর্থাৎ, জ্ঞানের উৎসটি কি? দ্বিতীয় বিষয়টি হলো কি পদ্ধতিতে জ্ঞানটি অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ, কিভাবে জ্ঞানটি অর্জিত হয়েছে? তৃতীয় বিষয়টি হলো, যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়েছে তার ফলাফলটি কি হয়েছে? অর্থাৎ, অর্জিত জ্ঞান কোন পার্থক্য তৈরি করেছে কি?

কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতিতে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের বক্তব্যকে জ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতিতে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের বক্তব্যকে জ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এরা হতে পারেন উপজাতীয় সমাজে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ব্যক্তি, পুরোহিত শাসিত সমাজে প্রধান ধর্মযাজক, রাজতন্ত্রে রাজা, প্রযুক্তিবিদদের সমাজে বৈজ্ঞানিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, ইত্যাদি। যে কোন সমাজে বিভিন্ন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস হিসাবে কাজ করে।

অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা হয়।

অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা হয়। এই ব্যক্তি বা শক্তি হতে পারেন কোন ধর্মীয় পথ প্রদর্শক, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, সৃষ্টিকর্তা, বা অন্য যে কোন মাধ্যম। এ দিক থেকে অতীন্দ্রিত পদ্ধতি কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতির মতই। কিন্তু জ্ঞান অর্জনকারীর মনোশারীরিক অবস্থা ও অতিপ্রাকৃত সংকেত প্রকাশের উপর নির্ভরশীলতা এ পদ্ধতির সাথে কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতির পার্থক্য তৈরি করে। অর্থাৎ, অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি আচার ও আনুষ্ঠানিকতার উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। তীব্র বিষাদগ্রস্ততা, অসহায়ত্ব এবং উন্মত্ততাজনিত পরিস্থিতিতে অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে উৎপাদিত জ্ঞানের প্রতি মানুষ বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

যুক্তিবাদী পদ্ধতির মূল বক্তব্যটি হলো যে, নীতিগতভাবে যা সত্য তা যৌক্তিকভাবে অনুমান করা সম্ভব।

অন্যদিকে, যুক্তিবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যার অন্তর্নিহিত ধারণাটি হলো যে, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চমসূহের পর্যবেক্ষণ ছাড়াই মানুষের মন পৃথিবীকে বুঝতে পারে, এবং আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্বেই জ্ঞানের আকার আমাদের মনে অস্তিত্বমান থাকে। অন্য কথায়, যুক্তিবাদী পদ্ধতির মূল বক্তব্যটি হলো যে, নীতিগতভাবে যা সত্য তা যৌক্তিকভাবে অনুমান করা সম্ভব। ধ্রুপদী যুক্তিবাদীদের মতে পূর্ব ধারণাগত জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের মন এক ধরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতের ছাপ তৈরি করে। কিন্তু সমকালীন যুক্তিবাদের পরম প্রকাশটি হলো বিমূর্ত। যেমন, বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র এমন কিছু ধারণা দিয়ে গঠিত যা সার্বজনীনভাবে যথার্থ, নিশ্চিত এবং বাস্তব জগত থেকে স্বাধীন। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, বিশুদ্ধ জ্যামিতি বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুই বলে না, কিন্তু এর প্রস্তাবনাগুলো যুক্তির রূপগুলোর (forms of logic) কারণেই সত্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যদিও

বিশুদ্ধ গাণিতিক সূত্র এবং রীতিসিদ্ধ যুক্তি প্রয়োজনীয়, কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানে এগুলোর প্রায়োগিক মূল্য নিরূপিত হয় তখনই, যখন এগুলো কোন বিষয়বস্তুকে যথাযথ উপায়ে বুঝতে সাহায্য করে।

অনুসন্ধানের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা (Eternal Desire of Inquiry)

কোন বিষয় সম্পর্কে মানুষের জানবার ইচ্ছা সার্বজনীন এবং অসীম। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানুষ নিজের অবস্থা বা কোন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করে। আর মানুষ তা করে কার্য-কারণ এবং সম্ভাবনামূলক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। মানুষের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হবে তা কোন না কোনভাবে অতীত এবং বর্তমান অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, আমরা জানি যে, নিয়মিত ও মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলে ভালো ফলাফল করা যায় এবং ভালো ফলাফল করলে ভালো বেতনের চাকুরী পাওয়া যায়। এ ধরণের কার্য-কারণ সম্পর্কগুলো সাধারণতঃ সম্ভাবনামূলক প্রকৃতির হয়ে থাকে। কারণ, যদিও একজন ছাত্র জানে যে, নিয়মিত ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে ভালো ফলাফল করা যায় এবং ভালো ফলাফল করলে ভালো বেতনের চাকুরী পাওয়া যায়, কিন্তু সব সময়ই তা ঘটে না। কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে এবং কখনও কখনও ঘটছে না, তা আমরা কিভাবে জানবো?

প্রতিটি মানুষ নিজের অবস্থা বা কোন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার আকাঙ্খা প্রদর্শন করে। আর মানুষ তা করে কার্য-কারণ এবং সম্ভাবনামূলক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

আমরা তা জানতে পারি ঐতিহ্য থেকে। সমাজের প্রতিটি মানুষ এক ধরণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে মানুষ তার অনুসন্ধিৎস্যু মনে উদ্ভূত অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়। মানুষ এই জানাগুলোকে সত্য বলে মনে করে। কারণ, সবাই এগুলোকে জানে এবং গ্রহণ করে। ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সুবিধা হলো, এগুলো অনুসন্ধান করে জানতে হয় না। এগুলো সবাই জানে এবং এগুলো প্রদত্ত। তবে ঐতিহ্যগত জ্ঞান কখনও কখনও সত্য অনুসন্ধানকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন, যা সবাই জানে তা থেকে ভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করলে তা সহজে গ্রহণযোগ্য হয় না। এর ফলে, কোন বিষয় সম্পর্কে নতুন করে জানার উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার জন্ম হয় না এবং জ্ঞানের বিকাশ রূদ্ধ হয়ে পড়ে।

সমাজের প্রতিটি মানুষ এক ধরণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে মানুষ তার অনুসন্ধিৎস্যু মনে উদ্ভূত অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়।

কিন্তু তার পরেও দেখা যায় যে, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। ঐতিহ্যের পাশাপাশি অন্যদের দ্বারা আবিষ্কৃত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমৃদ্ধ করে তুলি। অন্যদের দ্বারা আবিষ্কৃত এই জ্ঞানগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে আবিস্কর্তার মর্যাদার উপর। একজন বিশেষজ্ঞের মতামতকে আমরা যত সহজে গ্রহণ করি, একজন সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে আমরা তত সহজে গ্রহণ করি না। এই বিশেষজ্ঞদের আমরা কর্তৃত্ব (authority) বলে থাকি। কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি আমাদের নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে কোন ভ্রান্তি থাকে, তবে তা আমাদের মধ্যে সহজেই বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। যদি আমরা এমন কোন কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করি, যে কর্তৃত্ব নিজস্ব দক্ষতার অতিরিক্ত বক্তব্য রাখেন, তবে সত্য অনুসন্ধান বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, কোন ব্যক্তি জৈব রাসায়নিক জ্ঞান ছাড়াই যদি কোন ভেষজ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন, তবে সেই মতামত ভ্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

ঐতিহ্যের পাশাপাশি অন্যদের দ্বারা আবিস্কৃত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমৃদ্ধ করে তুলি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ঐতিহ্য এবং কর্তৃত্ব হলো বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের দু'দিকে ধারালো একটি তরবারির মত। সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের দিক নির্দেশ করে থাকে বটে, তবে তা কখনও কখনও বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। যদি আমরা ঐতিহ্য ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করতে না চাই, সে ক্ষেত্রে বিশ্ব জগৎকে জানার ও বোঝার জন্য নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে নিজস্ব উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কারণে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নেবার বহু সুযোগ রয়েছে। ভ্রান্তি জন্ম দিতে পারে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে আলোচনা করা হলো।

নিজস্ব উদ্যোগে অনুসন্ধানের ভ্রান্তি (Errors in Personal Inquiry)

ভুল পর্যবেক্ষণ (Inaccurate Observation): আমরা জানি যে, যে কোন অনুসন্ধানের মূল চাবিকাঠি হলো পর্যবেক্ষণ। কিন্তু আমরা জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে সাধারণতঃ অপরিকল্পিতভাবে বা

সামনে যা দৃশ্যমান ই আমরা পর্যবেক্ষণ র্থ হই এবং যা নেই নক কিছু ভুল করে পর্যবেক্ষণ করি।

অসচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। যেমন, যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে, যে ব্যক্তির সাথে সর্বশেষ দেখা হয়েছে সে ব্যক্তির পরনে কি রঙের জামা ছিল? আমরা অনেকেই হয়তো নিশ্চিত করে তা বলতে পারবো না। কারণ, আমরা সেটি সবসময় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করি না। অর্থাৎ, আমরা যখন কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করি, তখন প্রতিটি বিষয় আমরা খুঁটিয়ে দেখি না। ফলে, আমরা ভুল করি। অন্য কথায়, আমাদের সামনে যা দৃশ্যমান তার অনেককিছুই আমরা পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হই এবং যা নেই এরকম অনেক কিছু ভুল করে পর্যবেক্ষণ করি।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, একজন বিদেশী পর্যটক বাংলাদেশে বেড়াতে এসে কিছু আগন্তুকের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। এ ঘটনা থেকে বিদেশী পর্যটক ভাবতে পারেন যে, পর্যটকদের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ স্থান নয়। কিন্তু বিদেশী পর্যটকের এই পর্যবেক্ষণ সঠিক নাও হতে পারে। কারণ, যে সকল আগন্তুক তাকে আক্রমণ করেছিল তারাও সম্ভবত ছিল বিদেশী পর্যটক। তাহলে, বিদেশী পর্যটক কেন এই উপসংহার টানলেন? কারণ, যে সকল আগন্তুক তাকে আক্রমণ করেছিল তারা দেখতে অনেকটা বাংলাদেশীদের মত এবং যেহেতু তারা ইংরেজীতে কথোপকথন করেছিল সেহেতু তার পক্ষে বোঝার উপায় ছিল না যে তারা বাংলাদেশী না বিদেশী। অপরিকল্পিত এবং সাদা মাটা পর্যবেক্ষণ সবসময়ই ভুল সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়। পরিকল্পিত উপায়ে সচেতন পর্যবেক্ষণ এ ধরণের ভ্রান্তি হ্রাস করে। যেমন, সর্বশেষ দেখা ব্যক্তির পরনে কি রঙের জামা ছিল, তা যদি লিখে রাখা হতো তাহলে আমরা সহজেই সঠিক উত্তর দিতে পারতাম। একইভাবে, শুধু বাংলাদেশীদের মত দেখতে এমন ধারণার উপর ভিত্তি না করে ঘটনাটিকে কিছুটা অনুসরণ করলেই সত্যটি জানা সম্ভব ছিল।

অতিসাধারণীকরণের প্রবণতা অধিক মাত্রায় প্রদর্শিত হয়, যখন কোন বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার তাগিদটি থাকে খুব বেশী।

অতিসাধারণীকরণ (Overgeneralization): আমরা যখন আমাদের চারপাশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি এবং সে সকল ঘটনাবলীর সুনির্দিষ্ট রূপ খুঁজতে চেষ্টা করি, তখন অল্প কিছু সমরূপ ঘটনাকে একটি সাধারণ রূপের প্রমাণ হিসাবে অনুমান করতে চাই। সাধারণতঃ, এ ধরণের অতিসাধারণীকরণের প্রবণতা অধিক মাত্রায় প্রদর্শিত হয়, যখন কোন বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার তাগিদটি থাকে খুব বেশী। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও আমরা এ ধরণের অতিসাধারণীকরণ করে থাকি। যেমন, কোন ঘটনা সম্পর্কে যখন একজন সাংবাদিক কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকে একই রকম মন্তব্য শুনতে পান, তখন তার ভিত্তিতেই তিনি ঘটনাটির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তৈরি করেন। এ ধরণের অতিসাধারণীকরণ সবসময়ই আমাদের ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অতিসাধারণীকরণের সমস্যাটিকে এড়ানো যায়। বৃহৎ সংখ্যার নমুনা নির্বাচনের মাধ্যমে এবং পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের মাধ্যমে ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করে বিজ্ঞানীরা তা করে থাকেন। একই গবেষণার পুনঃপুন অনুসন্ধান বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে। *প্রথমতঃ*, পুরো গবেষণাটি একই পরিস্থিতিতে পুনরায় পরিচালনা করে। পুনরায় অনুসন্ধান পরিচালনার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে যে, বারবার একই ফলাফল পাওয়া যায় কি না। *দ্বিতীয়তঃ*, একই গবেষণা কিছুটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিচালনা করে। ভিন্ন পরিস্থিতিতে গবেষণাটি পরিচালনা করে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কি না তা দেখা যেতে পারে, অথবা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বা বয়গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সমরূপতা বা ভিন্নতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। *তৃতীয়তঃ*, গবেষণাটি অন্য গবেষকদের দ্বারা স্বাধীনভাবে ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিচালনার মাধ্যমে। অন্য গবেষক যদি একই রকম ফলাফল না পান, বা কোন বিশেষ রূপের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়ে, তবে পূর্বের গবেষক যদি অতিসাধারণীকরণ করে থাকেন, তবে তা সহজেই চিহ্নিত হবে।

নির্বাচিত পর্যবেক্ষণ (Selective Observation): অতিসাধারণীকরণের অন্যতম বিপদটি হলো যে, এটি নির্বাচিত পর্যবেক্ষণের প্রবণতা তৈরি করে। যেমন, অনুসন্ধানের ফলে যদি দেখা যায় যে, বিশেষ কতগুলো সম্পর্কের সাধারণ রূপ বিদ্যমান এবং সেই সাধারণ রূপগুলোর ভিত্তিতে একটি সমস্যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে শুধুমাত্র সেই সকল রূপ পর্যবেক্ষণের প্রতি অনুসন্ধানকারীর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা থাকে বেশী। যে সকল সাধারণ রূপ পূর্বে ধরা পড়েনি, সে সকল রূপ পর্যবেক্ষণের প্রতি এক ধরণের অনীহা তৈরি হয়।

অতিসাধারণীকরণের অন্যতম বিপদটি হলো যে, এটি নির্বাচিত পর্যবেক্ষণের প্রবণতা তৈরি করে।

ধরা যাক, একটি আন্তবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী খেলার মাঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ফলে ধারণা করা হয় যে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সবসময়ই খেলার মাঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখলেই মনে হতে পারে যে, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু এই একটি বিশেষ ঘটনার ফলে সমাজবিজ্ঞানের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ এবং অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আচরণ পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত নাও হতে পারে। এই নির্বাচিত পর্যবেক্ষণ সবসময়ই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়।

পূর্ব পরিকল্পিত গবেষণা নক্শার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান এ ধরণের নির্বাচিত পর্যবেক্ষণকে প্রতিহত করে । যেমন, আমরা যদি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্ষণশীলতার মাত্রার ভিন্নতা জানতে চাই, সে ক্ষেত্রে একটি সুপরিকল্পিত গবেষণা নক্শার মাধ্যেমে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচন করে বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্কের পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রথম দশজন শিক্ষিত ব্যক্তি রক্ষণশীল এবং দশজন অশিক্ষিত ব্যক্তি উদার মনোভাব প্রদর্শন করলেও নমুনায় নির্বাচিত সকল ব্যক্তির মতামত না পাওয়া পর্যন্ত কোন উপসংহার টানা ঠিক নয়।

অনেক সময়, আমরা নিজের ধারণামত বানানো তথ্য থেকে উপসংহার টেনে থাকি।

মন-গড়া তথ্য (Made-up Information): অনেক সময়, আমরা নিজের ধারণামত বানানো তথ্য থেকে উপসংহার টেনে থাকি। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, বাস, রিক্সা বা ট্যাক্সীতে কোন জিনিস ফেলে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তা আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। এর ফলে আমরা ধারণা করি যে, রিক্সা, বাস বা ট্যাক্সীচালকেরা সৎ ব্যক্তি নন। কিন্তু যখন কোন রিক্সা বা ট্যাক্সীচালক হারানো জিনিস ফেরৎ দিতে আসে, তখন তার সততার প্রকৃত মূল্যায়ন না করে আমরা ধারণা করতে পারি যে, উলি- খিত রিক্সা বা ট্যাক্সীচালক হয়তো কোন মতলবে এসেছে, বা ভবিষ্যতে চুরি ডাকাতির মতলবে বাড়ি চিনতে এসেছে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এ ধরণের মন-গড়া ধারণার মাধ্যমে আমরা বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি, যা সম্পূর্ণভাবে ভুল ভিত্তির উপর তৈরি হয়। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে এ ধরণের মনগড়া তথ্যের কোন সুযোগ নেই। কারণ, যে কোন বিষয় সম্পর্কে উপসংহার টানার পূর্বে গবেষক একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তরদাতাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তথ্য আহরণ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুকল্প গঠন করেন এবং তা পরীক্ষার মাধ্যমে উপসংহার টানেন।

অযৌক্তিক যুক্তিবিন্যাস (Illogical Reasoning): অনেক সময়, আমরা এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করি, যা কোনভাবেই যৌক্তিক হয় না। কিন্তু তবুও আমরা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে তা করে থাকি। যেমন, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে যাবার আয়োজন করার পর যদি দেখা যায় যে, সপ্তাহের পাঁচ দিন বৃষ্টি হয় নি, তখন আমরা ভাবতে শুরু করি যে, ছুটির দিনে বৃষ্টি হতে পারে। কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হবার পর আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকি যে, একদিন কৃতকার্য হবোই। সাধারণতঃ, বাজী ধরার ক্ষেত্রে এ ধরণের অযৌক্তিক যুক্তির অবতারণা ঘটে। পরিসংখ্যানবিদগণ এ ধরণের অযৌক্তিক যুক্তিবিন্যাসকে 'জুয়াড়িদের ভ্রান্তযুক্তি' (Gambler's fallacy) বলে অভিহিত করেছেন। সচেতন এবং সুস্পষ্ট যুক্তির প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এ ধরণের ভ্রান্তিকে এড়িয়ে চলেন।

অহংসর্বস্ব উপলব্ধী (Egocentric Understanding): সাধারণ রূপের অনুসন্ধান এবং এর উপলব্ধি খুব সহজ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা নয়। এই চর্চার অনুশীলন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন ঘটনা এবং পরিস্থিতি আমাদের জন্য প্রায়ই বিশেষ মানসিক তাৎপর্য বহন করে। কেউ যদি চাকুরীচ্যুত হন বা পদোন্নতি পেতে ব্যর্থ হন, তখন সেই ব্যক্তি ভাবতে শুরু করেন যে, তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে পদোন্নতি দেবার জন্যই তিনি বাদ পড়েছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি একবারও তার নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা বা সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করেন নি। কোন ঘটনা বা বিষয়কে বোঝা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত অহংবোধকে জড়িত করলে সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এ ধরণের ব্যখ্যা দিয়ে থাকি এবং নিজের ও অন্যের জীবনকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করি। একজন বিজ্ঞানী যেখানে নিজেও একজন মানুষ, তারও এ ধরণের ভ্রান্ত উপসংহারে পৌঁছার ঝুঁকি থেকে যায়। যেমন, কিছু বিশেষ অনুমানের ভিত্তিতে একজন বিজ্ঞানী একটি

কোন ঘটনা বা বিষয়কে বোঝা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত অহংবোধকে জড়িত করলে সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

আবিষ্কার করলেন, কিন্তু কিছুদিন পর আরেকজন বিজ্ঞানী প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের অনুমানগুলো ভুল ছিল এবং ফলস্বরূপ, তার আবিষ্কারের ফলাফলও ভুল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানী যদি বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে নেন, তবে তিনি সত্যকে স্বীকার করবেন না এবং তার অনুসন্ধান হবে ত্রুটিপূর্ণ। অর্থাৎ, বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, উপলব্ধির মধ্যে নিজস্ব মূল্যবোধ আরোপের প্রবণতাকে ত্যাগ করতে হবে।

অতিসাধারণীকরণ, নির্বাচিত পর্যবেক্ষণ, মনগড়া তথ্য এবং অযৌক্তিক যুক্তিবিন্যাসের আত্মরক্ষামূলক ব্যবহার একটি অনুসন্ধান কার্যের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে।

অনুসন্ধানের অকাল সমাপ্তি (Premature Closure of Inquiry): অতিসাধারণীকরণ, নির্বাচিত পর্যবেক্ষণ, মনগড়া তথ্য এবং অযৌক্তিক যুক্তিবিন্যাসের আত্মরক্ষামূলক ব্যবহার একটি অনুসন্ধান কার্যের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। ধরা যাক, কেউ যদি এরকম বক্তব্য রাখেন যে, 'আমি বাংলাদেশের মানুষ; এই সমাজ সম্পর্কে আমার সব জানা আছে; নতুন তথ্য দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করা যাবে না'; তবে সেই ব্যক্তি সেখানেই তার জানার পথকে বন্ধ করে দিলেন। অনুসন্ধান কার্যের অকাল সমাপ্তি ব্যক্তি পর্যায়ের তুলনায় সামাজিক পর্যায়ে বেশী হয়ে যাকে। যেমন, সরকারী প্রতিষ্ঠান বা দাতা প্রতিষ্ঠান যদি কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য আর টাকা দিতে না চান, তখন তারা এ ধরণের যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে নতুন করে গবেষণার আর প্রয়োজন নেই। গবেষণার অকাল সমাপ্তির ফলে বিপদটি হলো যে, কোন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পূর্বেই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটি রূদ্ধ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কখনোই অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটে না, অবিরাম অনুসন্ধান হলো বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম।

প্রকৃতপক্ষে, কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ নয়। মানব জ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিনিয়তই পুরোনো জ্ঞানকে পরিবর্তন করে নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটছে। অতএব, যে কোন অনুসন্ধানের সমাপ্তিই হলো অকাল সমাপ্তি। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কখনোই অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটে না, অবিরাম অনুসন্ধান হলো বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম। যদি একজন বিজ্ঞানী তাঁর অনুসন্ধান বন্ধ করেন, তবে অন্য বিজ্ঞানীরা তা চালিয়ে যান।

রহস্যময়তা (Mystification): আমরা কখনোই প্রত্যাশা করি না যে, আমরা সবকিছু সম্পর্কে জানি। একজন মানুষ যত বুদ্ধিমান, বা যত পরিশ্রমী, বা যত চেষ্টাই করুক না কেন, দেখা যাবে যে, অনেক বিষয় এবং পরিস্থিতি রয়েছে যা তিনি বোঝেন না। যেমন, যত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টাই করি না কেন, আমরা কোনদিন বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবো না। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে না পারার সমস্যাটিকে অনেকে খুব সহজে অতিপ্রাকৃত বা রহস্যময় কোন কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। সে ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হয় যে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা কখনোই মানুষের জ্ঞান কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব নয়। হয়তো অনেক ঘটনা বা পরিস্থিতি রয়েছে, যা সম্পর্কে জানা সত্যিই কঠিন। কিন্তু যদি ধরেই নেয়া হয় যে, কিছু বিষয় সম্পর্কে জানা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, তবে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া থেমে যাবে। বিজ্ঞান কখনই বিশ্বাস করে না যে, কোন কিছু সম্পর্কে কোন ক্রমেই জানা সম্ভব নয়।

কোন সুসংবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ না করে অসচেতনভাবে এলোমেলো অনুসন্ধানের প্রয়াস সবসময়ই ভ্রান্ড় ধারণার জন্ম দেয়।

মানুষ মাত্রই ভুল হয় (To Err is Human): কোন সুসংবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ না করে অসচেতনভাবে এলোমেলো অনুসন্ধানের প্রয়াস সবসময়ই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, খুব সচেতনভাবে বিশেষ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ পর্যবেক্ষণের তুলনায় বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে সবসময়ই ভ্রান্তি কম হয়।

সারাংশ

জ্ঞানের যথার্থতা নির্ধারণ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্খা মানুষের চিরায়ত। বর্তমান পাঠে সমাজ গবেষণায় জ্ঞানের ভূমিকা, জ্ঞান অর্জনের উপায় এবং জ্ঞান অর্জনের নিজস্ব উদ্যোগ থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য ভ্রান্তিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গবেষককে এ সকল ভ্রান্তির প্রবণতাকে পরিহার করতে হবে। একজন গবেষককে কোন বিষয় সম্পর্কে উপসংহারে উপনীত হওয়ার পূর্বে, তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুকল্প পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয়। গবেষককে

মনে রাখতে হবে যে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেন তার মূল্যবোধ কোনভাবে গবেষণাকে প্রভাবিত না করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। পরিসংখ্যানবিদগণ Gambler's fallacy বলতে বুঝিয়েছেন:

ক. যৌক্তিক যুক্তির অবতারণাকে
খ. অযৌক্তিক যুক্তির অবতারণাকে
গ. যুক্তিহীন সংখ্যার মানকে
ঘ. যুক্তিযুক্ত সংখ্যার মানকে।

২। যুক্তিবাদী পদ্ধতির মূল বক্তব্যটি হলো:

ক. নীতিগতভাবে যা সত্য, তা যৌক্তিকভাবে অনুমান করা
খ. নীতিগতভাবে যা সত্য, তা যৌক্তিকভাবে অনুমান না করা
গ. নীতিগতভাবে যা সত্য, তা আবেগ দিয়ে বুঝানো
ঘ. উপরের সব।

৩। কার্য-কারণ সম্পর্কগুলো সাধারণতঃ

ক. নিঃসম্ভাবনামূলক প্রকৃতির হয়ে থাকে
খ. সম্ভাবনামূলক প্রকৃতির হয়ে থাকে
গ. সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনামূলক প্রকৃতির হয়ে থাকে
ঘ. স্থির প্রকৃতির হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জ্ঞান অর্জনের উপায় কী?

২। অযৌক্তিক যুক্তি বিন্যাস কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজ গবেষণায় জ্ঞান অর্জনের ভূমিকা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। জ্ঞানের সংজ্ঞা কী? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

গবেষণা পদ্ধতির যৌক্তিকতা - ২
Logic of Research Methodology – 2

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- গবেষণা কী
- সাধারণ জ্ঞান বনাম গবেষণা
- গবেষণা পদ্ধতির ভূমিকা

গবেষণা কী (What is Research)?

গবেষণা হলো জীবন ও জগতের সম্পর্কগুলোকে আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে আত্মিকরণ করার একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি।

কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নের সামাধান খুঁজে পাবার লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ অনুসন্ধান হলো গবেষণা। মানুষের মনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানবার কৌতুহল থেকে বহু গবেষণার জন্ম হয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সত্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বিকশিত হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রপঞ্চের সম্পর্কগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হলো গবেষণার অন্যতম কাজ। একমাত্র সুসংবদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রপঞ্চের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কগুলোকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলো থেকে আরো নতুন কোন বাস্তবতার সূত্র আবিষ্কার করা যায় কি না তা দেখা সম্ভব। গবেষণার লক্ষ্য হলো, পুরাতন তথ্য থেকে নতুন মাত্রা ও সাধারণীকরণের অনুসন্ধান করা, নতুন তথ্যের মাধ্যমে পুরাতন উপসংহারকে ঝালিয়ে নেয়া, নতুন ধারণার জন্ম দেয়া, বা জ্ঞানের অনাবিস্কৃত দিগন্তের উন্মোচন ঘটানো, এবং বিদ্যমান জ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দসমূহের সমাধান করা। সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে, গবেষণা হলো জীবন ও জগতের সম্পর্কগুলোকে আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে আত্মিকরণ করার একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, গবেষণার আসলেই কোন প্রয়োজন আছে কি? সাধারণ জ্ঞানই কি যথেষ্ট নয়? উত্তরে বলা যায়, সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট হতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সেই সাধারণ জ্ঞানকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যখনই সাধারণ জ্ঞানের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখনই বোঝা যায় যে, এর ভিত্তিটি দুর্বল হতে শুরু করেছে। সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান আমাদের কখনোই নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, সেগুলো সঠিক, না ভুল। কারণ, অনেক সময় আমরা ভুল যুক্তির উপর অর্জিত জ্ঞানকে সঠিক বলে মনে করতে পারি। যেমন, দীর্ঘদিন আমাদের সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী আমরা জানতাম যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল। কেন না, সাধারণ চোখে দেখে সে রকমই মনে হয়। কিন্তু সাধারণ চোখে দেখে কোন উপসংহার টানলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে প্রমাণ করেছেন যে, আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান সমতল পৃথিবী মূলতঃ গোলাকার। আমরা এও জানতাম যে, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। কিন্তু তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন আমরা জানি যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। অতএব, এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত উপসংহার যথার্থ নয়। এগুলো সবসময় প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে, সাধারণ জ্ঞানের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। এগুলো অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সাধারণ জ্ঞান এবং গবেষণার মধ্যে কি পার্থক্য বিদ্যমান তা আলোচনা করা যাক।

সাধারণ জ্ঞান বনাম গবেষণা (Common Sense versus Research)

সাধারণ জ্ঞান হলো মূল্যবোধ আরোপিত জ্ঞান। অন্যদিকে, গবেষণা হলো মূল্যবোধ বর্জিত বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান, যা যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ জ্ঞান হলো মূল্যবোধ আরোপিত জ্ঞান। অন্যদিকে, গবেষণা হলো মূল্যবোধ বর্জিত বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান, যা যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ জ্ঞান সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গবেষণা আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণের অতিরিক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান কখনো কোন ধারণাকে প্রশ্ন করে না, কিন্তু গবেষণা সবসময়ই প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে প্রশ্ন করে থাকে। আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় প্রতিদিন যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সে সকল পরিবর্তনই প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে। আমরা যা বিশ্বাস করি, সাধারণ পর্যবেক্ষণ সবসময়ই তা দেখতে নির্দেশ করে। কিন্তু গবেষণালব্ধ নিবিড় পর্যবেক্ষণ আমাদের ধরিয়ে দেয় যে, আমরা যা জানি, তা সবসময়ই আমরা যা জানি, ভাবি বা প্রত্যাশা করি তার থেকে ভিন্ন। এই নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন পূর্ব প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা, যা সাধারণ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।

সাধারণ জ্ঞান এবং গবেষণা উভয়ই উপলব্ধিগত ধারণাকে বিশুদ্ধকরণের একটি উপায় হিসাবে কাজ করে। কিন্তু গবেষণা এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কোন উপলব্ধিগত ধারণাকে বিশুদ্ধকরণের জন্য গবেষণা একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দু'ভাবে তার ভিত্তি তৈরি করে। *প্রথমতঃ*, পুরাতন ধারণাগুলোকে পরীক্ষা করে, এবং *দ্বিতীয়তঃ*, নতুন বিকল্প ধারণার জন্ম দেবার পর সেগুলোকেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। সাধারণ জ্ঞান কেবলমাত্র পরিচিত এবং প্রচলিত ধারণার মধ্যেই মানুষকে সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু গবেষণা সবসময় পরিচিত, প্রচলিত এবং পুরোনো বিশ্বাস ও ধারণাকে 'কি, কখন, কোথায়, কেন এবং কেমন করে' এই প্রশ্নগুলো উত্থাপনের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। সে জন্য গবেষকদের অনেক সময় 'পেশাগত সমস্যা সৃষ্টিকারী' (professional trouble makers) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

গবেষণা উপলব্ধিগত ধারণাকে কেবল বিশুদ্ধ বা সংশোধনই করে না, সেগুলোকে ব্যাখ্যাও করে।

গবেষণা উপলব্ধিগত ধারণাকে কেবল বিশুদ্ধ বা সংশোধনই করে না, সেগুলোকে ব্যাখ্যাও করে। অন্যদিকে, সাধারণ জ্ঞান কেবলমাত্র নিকটবর্তী লাভ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে নতুন প্রত্যয় ও ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারে না। যেমন, রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসকে দমন করতে চাইলেও তা করতে পারে না। কারণ, নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, নিজের দলের সন্ত্রাসীদের দল থেকে বিতাড়িত করলে বিরোধী দল এটিকে দুর্বলতা মনে করে সুযোগ নিতে পারে। এ ধরণের সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক ধারণার কারণেই তা আর সম্ভব হয়ে উঠে না।

সাধারণ জ্ঞান তাৎক্ষণিক ফলাফল ও পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সহাবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, রাজনীতিবিদগণ যখন সরকার গঠন করেন, তখন তাদের মধ্যে একদল মনে করেন যে, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করলে নির্বাচনে হেরে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, আবার অন্যদল মনে করেন যে, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করলে তা নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ ঘটাবে এবং তার ফলে পুনঃনির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দু'ধরণের বিশ্বাসই ভ্রান্ত।

সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গৃহীত সিদ্ধান সবসময়ই বিভ্রান্তকর হয়ে থাকে। অন্যদিকে, গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণভিত্তিক বাস্তব বর্ণনা প্রদান করে।

সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গৃহীত সিদ্ধান্ত সবসময়ই বিভ্রান্তিকর হয়ে থাকে। অন্যদিকে, গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণভিত্তিক বাস্তব বর্ণনা প্রদান করে। সর্বোপরি, যেহেতু এটি ধারণাগুলোকে প্রদত্ত মনে করে, সেহেতু সাধারণ জ্ঞানের না রয়েছে কোন তাত্ত্বিক কাঠামোগত ভিত্তি, না এটি অনুসরণ করে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অতএব, মুদ্রাস্ফীতি, অপরাধ প্রবণতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ইত্যাদি কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ সকল প্রশ্নের জবাব সাধারণ জ্ঞান দিতে পারে না। সাধারণ জ্ঞানের আওতায় এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিতই হয় না।

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাস্তব তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করে ভবিষ্যদ্বাণীকরণের মাধ্যমে তত্ত্ব নির্মাণের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেই তত্ত্ব পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আবার নতুন তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে চলতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য পদ্ধতির ভূমিকা কি? আমরা জানি যে, সব রকম মানব প্রতিক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও সবাই সব রকম প্রতিক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে পারেন

না। যদি আমরা সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হই, তবে সব ধরণের পরিবর্তন আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়বে না। যখন একজন ব্যক্তির জ্ঞানের উৎস হয় শুধুমাত্র পিতা মাতা, বন্ধু–বান্ধব, শিক্ষক, ধর্ম এবং গণমাধ্যম, তখন সেই ব্যক্তির ধারণাগুলো একটি অসচেতন ভাবাদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। কারণ, যে বিশ্বাস এবং মনোভাবকে একজন ব্যক্তি ধারণ করেন, সেগুলো তার সচেতনার বাইরে অবস্থান করে এবং পরিবর্তনের বিকল্প ধারণাগুলো তার জ্ঞান কাঠামোর অনুমানে থাকে না।

গবেষণা পদ্ধতির ভূমিকা (Role of Research Methodology)

বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে গবেষণা পদ্ধতি তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, যোগাযোগের বিধিমালা প্রদান করে; দ্বিতীয়তঃ, যৌক্তিক ও যথাযথ যুক্তিবিন্যাসের নিয়ম স্থাপন করে; এবং তৃতীয়তঃ, আর্ন্তব্যক্তিক যোগাযোগের নিয়ম নীতি প্রদান করে।

একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার, কৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ হলো গবেষণা পদ্ধতি। গবেষণা পদ্ধতি স্থির নিশ্চল কিছু নয়, এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং বিকাশমান একটি প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা পদ্ধতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে, গবেষণা পদ্ধতি তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে। *প্রথমতঃ*, যোগাযোগের বিধিমালা প্রদান করে; *দ্বিতীয়তঃ*, যৌক্তিক ও যথাযথ যুক্তিবিন্যাসের নিয়ম স্থাপন করে; এবং *তৃতীয়তঃ*, আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের নিয়ম নীতি প্রদান করে। বিষয়গুলোকে আরো কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

যোগাযোগের বিধিমালা (Rules for Communications): যখন মানুষ একই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে পারে না, তখন মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। প্রচলিত একটি গল্প দিয়ে বিষয়টিকে বোঝা যাক। একজন অন্ধ ব্যক্তিকে একটি গ্লাসে দুধ পান করতে দিলে সেই অন্ধ ব্যক্তিটি জানতে চাইলো:

'আমাকে কি খেতে দেয়া হয়েছে'?

উত্তরে বলা হলো: 'দুধ'।

অন্ধ ব্যক্তিটি পাল্টা প্রশ্ন করলো: 'দুধ কেমন'?

উত্তরে বলা হলো: 'দুধ সাদা'।

আবারো প্রশ্ন করলো অন্ধ ব্যক্তিটি: 'সাদা কেমন'?

উত্তরে জানানো হলো: 'সাদা বকের মত'।

এবারে অন্ধ ব্যক্তিটির প্রশ্ন হলো: 'বক কেমন'?

উত্তরে বলা হলো: 'বক কাস্তের মত'।

পাল্টা প্রশ্ন: 'কাস্তে কেমন'?

এবারে উত্তর প্রদানকারী ব্যক্তিটি আরো সহজভাবে বোঝানোর জন্য কোন বাক্য ব্যবহার না করে নিজের হাতটিকে কাস্তের মত বাঁকা করে অন্ধ ব্যক্তিটিকে স্পর্শ করতে বলে বললেন: 'কাস্তে এমন'।

অন্ধ ব্যক্তিটি উত্তর প্রদানকারীর হাতটি নেড়ে চেড়ে নিজের হাতটিকে একই রকম ভঙ্গি করে বললো: 'ও, এবার বুঝতে পেরেছি, দুধ এমন'।

এই কাল্পনিক গল্পটি থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, অন্ধ ব্যক্তিটি সত্যিকার অর্থে দুধ কেমন তা বুঝতে পারেনি এবং উত্তর প্রদানকারী ব্যক্তিটিও দুধ কেমন তা বোঝাতে সমর্থ হয়নি। এর কারণ হলো, দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন দু'জন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা একরকম নয়। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কখনো দুধ দেখেনি বলে সে বুঝতে পারে না দুধ কেমন। অন্যদিকে, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিটি দৃষ্টিহীন হবার অভিজ্ঞতা নেই বলে নিজের বর্ণনায় দুধ কেমন তা বোঝাতে পারছে না। অর্থাৎ, একই অভিজ্ঞতার অংশীদার নয় বলে এ ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগটি স্থাপিত হয়নি।

গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিজ্ঞানীদের মধ্যেকার যোগাযোগকে সহজতর করে তোলা। আর তা করা সম্ভব হয় কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে।

গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিজ্ঞানীদের মধ্যেকার যোগাযোগকে সহজতর করে তোলা। আর তা করা সম্ভব হয় কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে। গবেষণা পদ্ধতিবিজ্ঞান এই বিধিমালাগুলোকে সরবরাহ করে। পদ্ধতিবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে সুস্পষ্ট, উন্মুক্ত এবং সহজলভ্য করার মধ্য দিয়ে আমরা জ্ঞানের হুবহু অনুকরণ এবং গঠনমূলক সমালোচনার একটি কাঠামো প্রস্তুত করতে পারি। জ্ঞানের হুবহু অনুকরণের অর্থ হলো, একটি গবেষণামূলক অনুসন্ধানকে একই গবেষক বা অন্য কোন গবেষকের দ্বারা একইভাবে পুনরাবৃত্তি করা। এর মাধ্যমে আমরা যে কোন ধরণের ভ্রান্তি বা প্রতারণার বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে গবেষণার ত্রুটিগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। এটি করতে গিয়ে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে সেগুলো হলো: গবেষণায় যে উপসংহারগুলো টানা হয়েছে বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো গবেষণায় গৃহীত পূর্বধারণাগুলো থেকে যৌক্তিকভাবে অনুসৃত হয়েছে কি? পর্যবেক্ষণগুলো সঠিক হয়েছে কি? পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগুলো কি ছিল? অনুকল্প পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো যথাযথ ছিল কি? উপসংহার টানার সময় অন্য কোন উপাদান প্রভাব ফেলেছেল কি? ব্যাখ্যার সঠিকতার জন্য ফলাফলকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি? ইত্যাদি। গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এই প্রশ্নগুলো বারবার উত্থাপিত হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারটি হলো যুক্তি, যা বাস্তবসম্মত পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার টানার যথাযথ যুক্তি বিন্যাসের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

যুক্তিবিন্যাসের নীতিমালা (Rules for Reasoning): বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মৌলিক ভিত্তিটি হলো অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলোকে অবশ্যই সুশৃঙ্খল হতে হবে ও প্রণালীবদ্ধ যৌক্তিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারটি হলো যুক্তি, যা বাস্তবসম্মত পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার টানার যথাযথ যুক্তি বিন্যাসের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি পরিচালনার পূর্ব শর্ত হিসাবে যৌক্তিক যুক্তিবিন্যাস ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দক্ষতা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। দক্ষতা অর্জনের জন্য সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যস্তকরণ, এবং আরোহী ও অবরোহী সিদ্ধান্তের প্রকরণের নিয়ম; সম্ভাবনার তত্ত্ব; নমুনায়ন পদ্ধতি; গাণিতিক ও বীজগাণিতিক পদ্ধতি; এবং পরিমাপ প্রক্রিয়ার নিয়মাবলীগুলো সামাজিক বিজ্ঞানীদের কৌশল ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। এই পদ্ধতিগুলো জ্ঞান কাঠামোর অন্তর্নিহিত সঙ্গতিকে শক্তিশালী করে তোলে।

বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মূল লক্ষ্যটিই হলো আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। পদ্ধতিবিজ্ঞান এই প্রক্রিয়াটিকে নিশ্চিত করে।

আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের নীতিমালা (Rules for Intersubjectivity): যখন ভিন্ন পটভূমি থাকা সত্ত্বেও কোন প্রত্যয় বা তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বা গবেষক একই উপলব্ধিগত উপসংহারে পৌঁছান তখন বোঝা যায় যে, আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মূল লক্ষ্যটিই হলো আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। পদ্ধতিবিজ্ঞান এই প্রক্রিয়াটিকে নিশ্চিত করে। যুক্তির বিষয়টি যুক্তিবিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত, পর্যবেক্ষণলব্ধ সত্য বা পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ বাস্তব তথ্যের সাথে নয়। একটি ঘটনা আংশিকভাবে বা সম্ভাব্যভাবে সত্য হতে পারে তখনই, যখন তা বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপরীতভাবে, একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের দাবী তখনই যথার্থ হবে, যখন সেই জ্ঞান পূর্ব ধারণা থেকে যৌক্তিকভাবে আহরিত হয়। অতএব, একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ বাস্তব তথ্য থেকেও ত্রুটিপূর্ণ উপসংহার টানতে পারেন, যদি সেই পূর্ব ধারণাগুলো ভুল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ বাস্তবভিত্তিক তথ্য ব্যবহার না করলে শুদ্ধ যুক্তির মাধ্যমেও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। কারণ, কোন বক্তব্যের সত্যতা অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত হলেও বক্তব্যের যথার্থতাটি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সঙ্গতি বা এর সাথে অন্য বক্তব্যের সঙ্গতির সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, কেবলমাত্র যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সত্যকে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিজ্ঞান সত্যের যথার্থতা যাচাই-এর লক্ষ্যে পদ্ধতি ও কৌশল এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুনিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানদন্ডগুলোকে সরবরাহ করে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিজ্ঞান সত্যের যথার্থতা যাচাই-এর লক্ষ্যে পদ্ধতি ও কৌশল এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুনিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানদন্ডগুলোকে সরবরাহ করে। এই মানদন্ডগুলো পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুনিষ্ঠতা যথার্থতা যাচাই-এর উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, যতক্ষণ না যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে, ততক্ষণ বস্তুনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছে বলে দাবী করা যায় না। 'সত্য নিরঙ্কুশভাবে প্রদত্ত', এমন ধারণার বিপরীতে যদি মনে করা হয় যে, অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুনিষ্ঠতার

মানদন্ড এবং যথাযর্থতা যাচাই-এর পদ্ধতি মানুষের যুক্তিবাদী মন থেকে উদ্ভূত, তবে 'বস্তুনিষ্ঠতা'-এর (objectivity) পরিবর্তে 'আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ' (intersubjectivity) প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী যথাযথ। আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাধারণভাবে জ্ঞানকে, এবং বিশেষভাবে পদ্ধতিকে, এক মন থেকে অন্য মনে প্রেরণযোগ্য বা সঞ্চারণযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ, একজন গবেষক যদি একটি অনুসন্ধান পরিচালনা করেন, তবে অন্য গবেষকও সেই গবেষণার পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন এবং দুটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে তুলনা করতে পারবেন। যদি প্রথম গবেষণায় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তবে আমরা আশা করবো যে, দু'টি গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল একই রকম হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন পরিস্থিতির জন্ম হয়। এ পরিস্থিতিতে, আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের তাৎপর্যটি হলো যে, একজন গবেষক অন্য গবেষকের ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে পারেন এবং একই পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফরের যথার্থতা যাচাই করতে পারেন।

সারাংশ

এই পাঠে আমরা সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞা, সাধারণ জ্ঞান এবং গবেষণায় প্রাপ্ত জ্ঞান-এর পার্থক্য, গবেষণার ভূমিকা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক প্রপঞ্চের সম্পর্কগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখাই সামাজিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। সাধারণ জ্ঞান এবং গবেষণায় প্রাপ্ত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, সামাজিক গবেষণায় প্রাপ্ত জ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু। পরিশেষে, এটুকু বলা যায় যে, গবেষণায় প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জনের পূর্বে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। যেমন, মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের বিধিমালা, যুক্তিবিন্যাসের নীতিমালা, সঠিক পর্যবেক্ষণ, ইত্যাদি। একজন গবেষককে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে গবেষণার সাথে যুক্ত হওয়া উচিৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। গবেষণার অন্যতম কাজ হচ্ছে:

ক. সমাজ সম্পর্কে রচনা লেখা
খ. সমাজ সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়া
গ. সামাজিক প্রপঞ্চের সম্পর্কগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা
ঘ. সামাজিক প্রপঞ্চকে চিহ্নিত করা।

২। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে গবেষণা পদ্ধতি _____ প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে।

ক. একটি
খ. দু'টি
গ. তিনটি
ঘ. চারটি।

৩। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মৌলিক ভিত্তিটি হলো:

ক. মৌলিক উপাত্ত সংগ্রহ করা
খ. অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ
গ. উপাত্তকে পর্যবেক্ষণ করা
ঘ. উপাত্তকে সারণিবদ্ধ করা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণা কী?

২। সাধারণ জ্ঞান ও গবেষণার মধ্যে পার্থক্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সামাজিক গবেষণা কি একটি বিজ্ঞান? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। সাধারণ জ্ঞান ও গবেষণায় প্রাপ্ত জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

বিজ্ঞানের চর্চা
Practice of Science

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- বিজ্ঞান কী
- বিজ্ঞানের সনাতনী উপস্থাপন
- বিজ্ঞান সম্পর্কে অসনাতনী ধারণা
- বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চা

বিজ্ঞান কী (What is Science)?

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহের নিয়মবদ্ধ ও গাণিতিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রাপ্ত বাস্তব তথ্যপূর্ণ বিবরণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলে।

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহের (natural phenomena) নিয়মবদ্ধ ও গাণিতিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রাপ্ত বাস্তব তথ্যপূর্ণ বিবরণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলে। এই সাধারণ সংজ্ঞাটি থেকে মনে হতে পারে যে, বিজ্ঞান বোধ হয় শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করে। 'প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ' বলতে যদি প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় প্রকার প্রপঞ্চকেই বোঝায়, তবে এই সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা কিছুটা দূর হলেও অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় না। যেমন, অতিপ্রাকৃত প্রপঞ্চসমূহের আলোচনা কি বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা যায়? জ্ঞানের যে শাখা অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সে সকল শাখাকে কি বিজ্ঞান বলা যায়? বিজ্ঞান কি কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের এখতিয়ারভুক্ত চর্চা বা অনুশীলন? গাণিতিকভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায় না এমন বিষয়গুলো কি বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়? এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেয়া খুব সহজ নয়।

বিজ্ঞান শব্দটি প্রতিদিনের কথোপকথনের মধ্যে প্রায়শঃ ব্যবহৃত একটি শব্দ। প্রত্যেকেই শব্দটি এক সময় না এক সময় ব্যবহার করেছেন, অথচ বিজ্ঞানের প্রতিচ্ছবিটি একেক জনের মনে একেকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কারো কাছে এটি গণিতশাস্ত্রের মতো, কারো কাছে এটি সাদা কোট এবং গবেষণাগারের মত, কেউ কেউ এটিকে কৃৎকৌশলের সাথে গুলিয়ে ফেলেন, আবার অন্যেরা এটিকে স্কুল কলেজে পড়ানো বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে সমার্থক করে থাকেন। সাধারণ মানুষ, নীতি নির্ধারক, পন্ডিত এবং বিজ্ঞানী বলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই বিজ্ঞান শব্দটিকে ভিন্নভাবে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন, কারো কাছে মনে হতে পারে যে, বিজ্ঞান হলো একটি সুখ্যাতিজনিত মর্যাদাকর কর্মকান্ড, কেউ মনে করেন যে, এটি পদার্থ-বিদ্যা বা গণিতশাস্ত্রের মত জ্ঞানের একটি শাখা, আবার অন্যদের কাছে মনে হতে পারে যে, বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চসমূহের একটি বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান। বিজ্ঞান এককভাবে এর কোনটিই নয়। বিজ্ঞান কি তা সত্যিকারভাবে সুনির্দিষ্ট করা কঠিন।

বিজ্ঞান কার্যতঃ আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে বোঝার জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ড। এই কর্মকান্ডের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছেঃ বর্ণনা, সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের গঠন।

বিজ্ঞান কার্যতঃ, আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে বোঝার জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ড। এই কর্মকান্ডের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছেঃ বর্ণনা, সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের গঠন। *প্রথমতঃ*, পৃথিবীতে যে সকল বস্তু এবং ঘটনা দৃশ্যমান একজন বিজ্ঞানী সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বর্ণনা করেন। *দ্বিতীয়তঃ*, বিজ্ঞানী এ সকল দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন, কোন বিশেষ বস্তু অথবা তার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে কোন সম্পর্কের অস্তিত্ব রয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করেন। *তৃতীয়তঃ*, অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন, সেগুলোকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে একটি তত্ত্বের রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন, যা হলো প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ঘটনা এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্কসমূহের সাধারণ এবং যৌক্তিক বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা।

এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানী নয় এমন ব্যক্তিও বিজ্ঞানের এই তিনটি লক্ষ্যকে অনুসরণ করে থাকেন। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করি এবং বর্ণনা করি। আমরা সাধারণ নিয়ম খুঁজতে চেষ্টা করি এবং সে সকল সাধারণ নিয়মের সূত্র ধরে প্রাত্যাহিক জীবনে একটি দিক নিদের্শনামূলক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অবৈজ্ঞানিক হতে পারে এবং একজন সাধারণ মানুষের অনুসন্ধান সর্বোচ্চ মানে বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে। প্রশ্ন হলো, আমরা তা কিভাবে বুঝতে সক্ষম হবো? এটি বুঝতে হলে আমাদের সেই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা উচিৎ, যা একটি বিশেষ কর্মকান্ডকে কমবেশী বিজ্ঞানসম্মত করে তোলে। অর্থাৎ, আমাদের বিজ্ঞানের আদর্শ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে, কোন কর্মকান্ডটি বিজ্ঞানসম্মত এবং কোনটি নয়। তবে, বিজ্ঞান কি তা বুঝতে হলে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলোচনার পূর্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। সেগুলো হলো: *প্রথমতঃ*, পরিচিতিমূলক বিজ্ঞান কোর্সগুলোতে সনাতনীভাবে বিজ্ঞানকে যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে সে বিষয়টিকে; *দ্বিতীয়তঃ*, বিজ্ঞান সম্পর্কে অসনাতনী ধারণাকে; এবং *তৃতীয়তঃ*, বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চার প্রকৃতিকে।

বিজ্ঞানের সনাতনী উপস্থাপন (Traditional Presentation of Science)

বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিচিতিমূলক কোর্সগুলো বিজ্ঞানকে যেভাবে উপস্থাপন করে, তা এটিকে সহজ-সরল, সূক্ষ্ম এবং এমনকি নিত্যনৈমিত্তিক একটি বিষয় হিসাবে প্রতিফলিত করে। আমাদের বলা হয় যে, জীবন ও জগতের যে কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানীরা তাদের অনুসন্ধান কার্য শুরু করেন। তাদের আগ্রহ হতে পারে উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে, ক্যান্সারের কারণ নির্ণয় নিয়ে, অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে, বা আপেল কেন গাছ থেকে পড়ে, তা নিয়ে। এ সকল বিষয়বস্তু নিয়ে বিজ্ঞানীরা একনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, ফলাফলগুলোকে কিছু উচ্চতর বিমূর্ত পদের (terms) মধ্যে সংগঠিত করেন এবং সেই বিমূর্ত পদগুলোকে একটি কার্য-কারণ সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে সূত্রবদ্ধ করেন। এভাবে বিজ্ঞানীরা একটি তত্ত্বের জন্ম দেন, যা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রপঞ্চসমূহের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যার জন্য কতগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত যৌক্তিক প্রস্তাবনা হিসাবে উপস্থাপিত হয়। এই তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাগুলোর যথার্থতা পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীরা কতগুলো অনুকল্প গঠন করেন এবং সেগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সচেষ্ট হন।

তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবে বিমূর্ত এবং সাধারণ। অনুকল্প কিছুটা সুনির্দিষ্ট হলেও সাধারণভাবে তা বিমূর্ত থেকে যায়।

তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবে বিমূর্ত এবং সাধারণ। অনুকল্প কিছুটা সুনির্দিষ্ট হলেও সাধারণভাবে তা বিমূর্ত থেকে যায়। এগুলোকে পর্যবেক্ষণযোগ্য করে তুলতে হলে বিমূর্ত পদগুলোকে কার্যকর পদে (operational terms) রূপান্তর করতে হয়। বিজ্ঞানীরা কতগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য সূচক (observable indicators) নির্ণয়ের মাধ্যমে তা করে থাকেন। যেমন, যদি একজন বিজ্ঞানী কোন বিশেষ ধরণের উদ্ভিদের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের উপর তাপমাত্রার প্রভাব পরীক্ষা করতে চান, তবে তাকে তাপমাত্রা এবং প্রবৃদ্ধি প্রত্যয় দু'টির পরিমাপ প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ, কতগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য সূচকের মাধ্যমে বিমূর্ত পদগুলোর কার্যকর সংজ্ঞায়ন করতে হবে। এরপর, তিনি অনুকল্প পরীক্ষার জন্য একটি উপযোগী পরীক্ষণের (experiment) বর্ণনা দেবেন, পরীক্ষণ পরিচালনার জন্য কতটুকু সময় লাগবে তা নির্ধারণ করবেন, এবং পরীক্ষার ফলাফলগুলোকে কিভাবে লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা হবে তার বর্ণনা দেবেন।

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞানী তার কর্মকান্ড শুরু করেন। উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, উপাত্তকে প্রস্তুত করে তা বিশ্লেষণ করা হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, সংগৃহীত উপাত্ত পূর্ব নির্ধারিত অনুকল্পগুলোকে সমর্থন করেছে কি না। যদি অনুকল্পগুলো উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে যে তত্ত্ব থেকে অনুকল্পগুলো আহরণ করা হয়েছিল সে তত্ত্বটিও সমর্থিত হয়। যদি অনুকল্পগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে প্রস্তাবিত তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ফলাফল যাই হোক না কেন, প্রাপ্ত ফলাফলকে বিজ্ঞানীরা প্রচার করেন এবং নতুন একটি বিষয় নিয়ে, বা ঐ বিষয়ের আরো বিকাশের লক্ষ্যে নতুন করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য সচেষ্ট হন।

সনাতনী ধারণা অনুযায়ী, যেহেতু বিজ্ঞানী একটি যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তার কর্মকান্ড পরিচালনা করেন, সেহেতু তার উপসংহার সাধারণ মানুষের ভাববাদী অনুমান ও সংস্কার থেকে অনেক উন্নত মানের হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হয়। বিজ্ঞানীরা তথ্য ও সংখ্যার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যকে উপস্থাপন করেন এবং আমাদের বলা হয় যে, 'সংখ্যা মিথ্যা বলে না'। সনাতনী বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, তত্ত্ব নির্মাণের জন্য যে কল্পনাশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় সে তুলনায় উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞানী সবকিছুই পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দেন বলে একজন সহকারী সহজেই পরীক্ষণটি পরিচালনা করতে পারেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারেন।

বিজ্ঞান সম্পর্কে অসনাতনী ধারণা (Nontraditional Ideas about Science)

বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী সম্পর্কে পন্ডিতগণ সাম্প্রতিককালে যে চিত্র প্রদান করেছেন, তা সনাতনী উপস্থাপন থেকে অনেকটা ভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা মনে করেন যে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সম্পর্কে যে প্রতিমার প্রতিচ্ছবি তৈরি করা হয়েছিলো, তা তারা বিচূর্ণ করে বিজ্ঞানকে খোলসমুক্ত করেছেন। এরা অনেকটা প্রতিমা পূজাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এদের মতে, বিজ্ঞানীরা অন্যান্য মানুষের মত একই মানবিক আবেগ দ্বারা প্রেষিত (motivated) হন এবং একই প্রতিকূলতার দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। বিজ্ঞানীরা প্রায়শঃ নিজেদের দুর্বলতা বা পক্ষপাতদুষ্ট পছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। এমন কি, তারা তাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে নিজেদের পোষ্য ধারণাগুলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্মিত এবং পরিচালিত পরীক্ষণের পরিবর্তে বিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে স্থাপনের জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী সম্পর্কে পন্ডিতগণ সাম্প্রতিককালে যে চিত্র প্রদান করেছেন, তা সনাতনী উপস্থাপন থেকে অনেকটা ভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা মনে করেন যে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সম্পর্কে যে প্রতিমার প্রতিচ্ছবি তৈরি করা হয়েছিলো, তা তারা বিচূর্ণ করে বিজ্ঞানকে খোলসমুক্ত করেছেন।

আরো যুক্তি তোলা হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক জগতের বিভিন্ন চক্র এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের স্বার্থের বাইরে অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেন না। যেমন, প্রকাশনার জন্য গবেষণা প্রবন্ধ বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক মূল্যের চেয়ে গবেষকের ডিগ্রী, পদবী এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতাকে অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেয়া হয়। একজন বিশেষ বিজ্ঞানীর ছাত্র দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকীতে অন্য বিজ্ঞানীর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের প্রবন্ধ বাতিল করে দেবার অভিযোগও রয়েছে। প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন উদ্ভাবনীয় ধারণা সম্বলিত প্রবন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয় না।

পান্ডিত্য এবং মৌলিক অবদানের চেয়ে পৃষ্ঠপোষকের, বা পৃষ্ঠপোষকতা দেয়, এমন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা প্রতিবেদনের মাধ্যমে গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। এ সকল পর্যালোচক বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দেখা গেছে যে, গবেষণা প্রস্তাবনাকারীর চেয়ে অনেক কম যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা সে সব গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবনাকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। কিছু খ্যাতিমান গবেষকের আত্মজীবনীমূলক লেখা প্রকাশের ফলে বিজ্ঞানের বর্তমান সমালোচনাগুলো আরো বেশী তীব্র হয়েছে। সে সব লেখায়, গবেষকরা তাদের গবেষণা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য এবং নবীন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী গবেষকদের পথ প্রদর্শনের জন্য কিছু মুক্ত আলোচনা করেছেন। যেহেতু এ সকল প্রকাশনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ত্রুটি, অসাবধানতাবশতঃ ভুল এবং অন্যান্য বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরেছে, সেহেতু বিজ্ঞানের অনেক সাম্প্রতিক সমালোচক সেগুলোকে বিজ্ঞান যে একটি ফাঁকা খোলস তার অভ্যন্তরীণ স্বীকারোক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

বিজ্ঞানের এ সকল সমালোচনার প্রধান বিপদটি হলো যে, এগুলো বিজ্ঞানকে বোঝার যে অসুবিধা সেই অসুবিধাগুলো থেকে পালানোর একটি সহজ পথ করে দিতে পারে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে পরিসংখ্যান বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুক্তিগুলো শেখার চেয়ে বিজ্ঞানকে একটি অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানমূলক উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত করার সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। যে সব কর্মকান্ডকে 'বৈজ্ঞানিক' বলে অভিহিত করা হয়, যদিও তার সবগুলোই বৈজ্ঞানিক নয়, তবুও অনেক বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড অন্যান্য মানব কর্মকান্ড থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতাগুলো উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং

বিজ্ঞানের এ সকল সমালোচনার প্রধান বিপদটি হলো যে, এগুলো বিজ্ঞানকে বোঝার যে অসুবিধা সেই অসুবিধাগুলো থেকে পালানোর একটি সহজ পথ করে দিতে পারে।

জরুরী। একদিকে, যেমন বিজ্ঞান সম্পর্কে সনাতনী ধারণাগুলো অপর্যাপ্ত এবং সীমাবদ্ধতায় দুষ্ট, অন্যদিকে, তেমনি বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডকে মন্দ বলে গালমন্দ করাও সঠিক নয়। অতএব, আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃতিকে জানা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চা (Modern Practice of Science)

সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি এ রকম ধারণা দেয় যে, একজন বিজ্ঞানী কোন প্রপঞ্চের প্রতি তার আগ্রহ থেকে সরাসরি তত্ত্ব আহরণে অবতীর্ণ হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কদাচিৎ এমনটি ঘটে। কোন প্রপঞ্চের প্রতি বিজ্ঞানীর প্রাথমিক আগ্রহ প্রায়ই জন্ম নেয় কোন পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা থেকে। সম্ভবতঃ, তার নিজের গবেষণার কোন ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক ফলাফল, অথবা অন্য কোন গবেষকের গবেষণা থেকে তার আগ্রহের জন্ম হয় । অন্য কথায়, একজন বিজ্ঞানী একটি সাধারণ আবিষ্কার (যেমন, দু'টি চলকের পারস্পরিক সম্পর্ক) থেকে শুরু করে বিষয়টিকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য নিজেকে তৈরি করেন।

বিজ্ঞানের সনাতনী উপস্থাপনে অবরোহী যুক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আরোহী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমেও সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণীকরণ করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়।

বিজ্ঞানের সনাতনী উপস্থাপনে অবরোহী যুক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অবরোহী পদ্ধতির ফলাফল নয়। আরোহী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমেও সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণীকরণ করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। তত্ত্ব সাধারণভাবে অনেক অভিজ্ঞতালব্ধ আরোহী এবং অবরোহীমূলক কর্মকান্ডের শেষ ফলাফল। এক পর্যায়ে বিজ্ঞানী হয়তো একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পর্কের জন্য একটি পরীক্ষামূলক বা আপাতঃস্থিরকৃত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন, তিনি আরো তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এটিকে আংশিকভাবে পরীক্ষা করতে পারেন, নতুন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তিনি তার ব্যাখ্যাকে পরিমার্জিত করতে পারেন, অথবা আরো তথ্য সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখতে পারেন। অতএব, তত্ত্ব গঠন মূলতঃ অবরোহ এবং পর্যবেক্ষণের একটি মিথষ্ক্রিয়া।

যখন একটি তত্ত্ব বৃহৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, তখন তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

বিজ্ঞানে খুব কম গবেষণাই রয়েছে, যেখানে কোন তত্ত্ব পুরোপুরি গৃহীত হয় বা প্রত্যাখ্যাত হয়। তার পরিবর্তে বরং দীর্ঘদিনের প্রমাণ এবং সমর্থন সংগ্রহ সাপেক্ষে একটি তত্ত্ব ক্রমাগতভাবে পরিমার্জিত হয়। সব তত্ত্বই ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বিকশিত হয়। কোন বিজ্ঞানীই কখনো পুরো সত্যটি আবিষ্কার করতে পারেন না। কারণ, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাখ্যা রয়েছে। গবেষক সাধারণতঃ, প্রত্যয়সমূহের অস্থায়ী কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করে থাকেন। যখন একটি তত্ত্ব বৃহৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, তখন তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

বিজ্ঞানের সনাতনী ধারণাটি আমাদের বলে যে, তত্ত্ব গঠন এবং পরীক্ষা নির্মাণের জন্য অধিক পরিমাণে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন এবং পরীক্ষাটিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি তেমন উদ্ভাবনীমূলক নয়, তা কেবল কিছু নৈমিত্তিক কর্মকান্ড মাত্র। এই সনাতনী ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল। কার্যতঃ, একটি পরীক্ষণের বাস্তবায়ন এবং অভিজ্ঞতামূলক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অসংখ্য জটিল সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। কারণ, পরীক্ষণ বাস্তবায়নকালে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে, পরিমাপমূলক ভ্রান্তির ফলে অদ্ভুত রকমের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ হতে পারে, উপাত্ত হারিয়ে যেতে পারে, বা ভুল বলে প্রমাণিত হতে পারে, ইত্যাদি।

প্রত্যয়ের কার্যকর সংজ্ঞায়ন কখনই সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট থাকে না এবং পরীক্ষণ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলোকে আরো সুনির্দিষ্ট করে তুলতে হয়।

প্রত্যয়ের কার্যকর সংজ্ঞায়ন কখনই সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট থাকে না এবং পরীক্ষণ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলোকে আরো সুনির্দিষ্ট করে তুলতে হয়। এ ধরণের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়, যা গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ, একটি গবেষণা প্রকল্পের মান নির্ভর করে অনেক পার্থিব সিদ্ধান্ত এবং কর্মকান্ডের উপর, যা উপাত্ত সংগ্রহ থেকে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। একজন গবেষণা প্রকল্প পরিচালক যদি নিজেকে এসব কর্মকান্ডের মধ্যে সম্পৃক্ত না করেন, তবে তিনি একটি অর্থহীন গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার মত মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য কুফল সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি হলো বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

সারাংশ

সামাজিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়া। আর তাই যে কোন গবেষণা শুরু করার আগে বিজ্ঞান কি, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কি, তা ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিৎ। বর্তমান পাঠে এ বিষয়গুলোই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে, উপস্থাপন করা হয়েছে বিজ্ঞান সম্পর্কে সনাতনী ও অসনাতনী ধারণা, বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য। গবেষণা শুরুর পূর্বশর্ত হিসাবে ঐ বিষয়গুলো একজন গবেষককে বুঝে নিয়ে গবেষণা শুরু করার উপরই নির্ভর করবে গবেষণার মানসম্মত ফলাফল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। মানুষের আচরণের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ,

ক. মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব
খ. মানুষের আচরণ অনেক বেশী ভিন্নতা প্রদর্শন করে
গ. মানুষ পরিবেশের সাথে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নেয়
ঘ. মানুষের আচরণে শত্রু এবং মিত্র উভয়ই প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

২। তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবে:

ক. মূর্ত এবং সাধারণ
খ. বিমূর্ত এবং সাধারণ
গ. তৈরি হয়
ঘ. সংখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

৩। তত্ত্ব সমর্থিত হয় যখন:

ক. অনুকল্প উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত হয়
খ. অনুকল্প গবেষকদের দ্বারা স্বীকৃতি পায়
গ. অনুকল্প লিখিত আকারে প্রকাশ পায়
ঘ. অনুকল্প সম্পর্কে গবেষণার জগতে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বিজ্ঞান কী?

২। বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কী ভাবেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। বিজ্ঞান সম্পর্কে সনাতনী এবং আধুনিক ধারণার পার্থক্য আলোচনা করুন।

২। বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চা আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

সামাজিক বিজ্ঞানের যুক্তি
Logic of Social Science

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- সামাজিক বিজ্ঞান কী বিজ্ঞান
- সামাজিক প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ
- সামাজিক সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার
- সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ
- সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য

সামাজিক বিজ্ঞান কী বিজ্ঞান (Is Social Science a Science)?

সামাজিক বিজ্ঞানের অধীনে অধীত বিষয়গুলোর (যেমন, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, এমন কি, ভূগোল, ইতিহাস ও যোগাযোগ বিষয়ক বিষয়সমূহ) বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নিয়ে একটি পান্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্কের মূল বিষয়টি হলো মানব আচরণকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করা যায় কি না। সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনার বিষয়ে যে আপত্তিগুলো তোলা হয়, সেগুলো হলো:

প্রথমতঃ, মানুষের আচরণ এক মূহুর্ত থেকে আরেক মূহুর্তে খুব বেশী পরিবর্তিত হয় বলে তা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীকরণকে অসম্ভব করে তোলে। মানুষের আচরণ জটিল এবং অনেক বেশী ভিন্নতা প্রদর্শন করে। মানুষের আচরণকে শ্রেণী বিভক্ত করা খুব কঠিন। ফলে, তার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। মানব আচরণের মধ্যে সবসময় এক ধরণের অনিশ্চিতি বিরাজ করে। একই পরিস্থিতিতে সকল মানুষ একই রকম আচরণ করে না। এমন কি একই ব্যক্তি সবসময় একই রকম আচরণ করে না। একজন ব্যক্তি এক রকম পরিস্থিতিতে ভিন্ন আচরণ করে বলে সাধারণ নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের আচরণ খুবই বিস্মৃতিপ্রবণ, সূক্ষ্ম এবং জটিল। মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিকগুলো মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় না। যেমন, দু'জন ব্যক্তির মধ্যেকার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে পরিমাপ করা বেশ কঠিন।

তৃতীয়তঃ, যেহেতু মানুষের আচরণ কেবলমাত্র মানুষ দ্বারাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়, সেহেতু মানুষের পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে তথ্যের বিকৃত উপস্থাপন হতে পারে। আর তা যদি ঘটে তবে সত্য অর্জনের জন্য কোন বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি থাকে না।

চতুর্থতঃ, যেহেতু মানুষই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু, সেহেতু মানুষের জন্য আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর যে লক্ষ্য ঠিক করি তা মানুষ সহজেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যর্থ করে দিতে পারে। ফলে, মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের পদ্ধতি প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব, নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংগ্রহ করা সবসময় সম্ভব হয়ে উঠে না।

সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দানের বিরোধীতাটি সামাজিক বিজ্ঞানের ভিতর এবং বাহির দু'দিক থেকেই জন্ম নিয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের ভিতর থেকে বিরোধীতার ক্ষেত্রে এর বিশেষায়নগুলোই অনেকটা দায়ী।

সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দানের বিরোধীতাটি সামাজিক বিজ্ঞানের ভিতর এবং বাহির, দু'দিক থেকেই জন্ম নিয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের ভিতর থেকে বিরোধীতার ক্ষেত্রে, এর বিশেষায়নগুলোই (specialization) অনেকটা দায়ী। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকার ও রাজনীতি, অর্থনীতিতে ইকোনোমেট্রিক্স, ইতিহাসে হিস্টোরিওগ্রাফি, ইত্যাদির মত বিশেষায়নগুলোকে বর্তমানে

বেশী গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞানের সনাতনী পন্ডিতগণ এটি পছন্দ করেননি এবং মনে করেছেন যে, বিশেষায়িত জ্ঞান হলো সীমিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পন্ডিতগণ মনে করেছেন যে, যে কোন বিষয়ের উপর জ্ঞানকে সূক্ষ্ম ও বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এর ফলে, সামাজিক বিজ্ঞানের পন্ডিতদের মধ্যে একটি পারস্পরিক বিরোধের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদদের মতে, মানুষের সামাজিক আচরণকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করা যায় না।

সামাজিক বিজ্ঞানের বাহিরের বিরোধিতাটি এসেছে পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদদের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পন্ডিতদের কাছ থেকে। এদের মতে, মানুষের সামাজিক আচরণকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করা যায় না। যখন সামাজিক বিজ্ঞানীরা নিজেদের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসমূহের আচার ও কৌশলগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করেছেন, তখন এই বিতর্কটি আরো জোরদার হয়েছে। এ ধরণের অনুকরণ বিভিন্নভাবে ঘটেছে। যেমন, গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পরিসংখ্যান ও গণিত শাস্ত্রের অযৌক্তিক প্রয়োগ, অস্পষ্ট পদাবলীর বিকাশ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত তত্ত্ব ও পদাবলীর বাছ-বিচারহীন ব্যবহার। অতি উৎসাহী সামাজিক বিজ্ঞানীরা সামাজিক আচরণকে বোঝার জন্য এমন সব পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, যা অনেক সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় নি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞানেও সাধারণ নিয়ম অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞানী সামাজিক আচরণের সাধারণ নিয়মকে বুঝতে চেষ্টা করেন, এবং এটি তিনি করেন সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, সম্পর্কসমূহের আবিষ্কার এবং তত্ত্ব গঠনের মাধ্যমে।

তবে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি, পদাবলী ও কৌশল অনুকরণ না করেও এটি প্রমাণ করা সম্ভব যে, অনু, প্রাণ-কোষ, ইত্যাদির মতো সামাজিক আচরণকেও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করা যায়। কারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞানেও সাধারণ নিয়ম অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞানী সামাজিক আচরণের সাধারণ নিয়মকে বুঝতে চেষ্টা করেন, এবং এটি তিনি করেন সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, সম্পর্কসমূহের আবিষ্কার এবং তত্ত্ব গঠনের মাধ্যমে। বিষয়গুলোকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

সামাজিক প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ (Observation and Measurement of Social Phenomena)

বিজ্ঞানের বিকাশের প্রথম ধাপটি হলো পরিমাপ এবং নিয়মবদ্ধ পর্যবেক্ষণ। সামাজিক বিজ্ঞানীরা কেন সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর পরিমাপ করতে পারবেন না তার কোন মৌলিক কারণ নেই। মানুষের বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, ইত্যাদি যেমন পরিমাপ করা সম্ভব, তেমনি মানুষের বৈবাহিক মর্যাদা এবং গড় আয়ুকেও পরিমাপ করা সম্ভব। সমষ্টিগত সামাজিক আচারণকেও সুসংবদ্ধভাবে পরিমাপ করা যায়। যেমন, একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী খুব সহজেই ভোটের আচরণ পরিমাপ করে ভোটের দিনে ভোটদানকারীরা সম্ভাব্য কি আচরণ করতে পারেন সেটি নির্ধারণ করতে পারেন। একইভাবে, ধর্মনিষ্ঠতা, উদারনৈতিকতা, রক্ষণশীলতা, ইত্যাদির মতো চলকগুলোকেও পরিমাপ করা সম্ভব। মনোভাবের পরিমাপকে প্রায়শঃ অবৈজ্ঞানিক বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুরুতে সব ধরণের পরিমাপই স্বেচ্ছাচয়িত সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত হয়। একজন সামাজিক বিজ্ঞানী একজন মানুষকে কখনোই দ্ব্যর্থহীনভাবে ধার্মিক বা অধার্মিক বলে অভিহিত করতে পারেন না, বরং তিনি মানুষকে আপেক্ষিকভাবে কম বা বেশী ধার্মিক বলে বর্ণনা করবেন। এটি শুধু সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই অনন্য নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ভূমিকম্পের জন্য Richter Scale, বা Hardness Scale প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আপেক্ষিকতার মাত্রাটি পরিলক্ষিত হয়।

সব ধরণের বৈজ্ঞানিক পরিমাপকে চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধানের উপযোগীতার ভিত্তিতে বিচার করা উচিৎ, নিরঙ্কুশ সত্যের ভিত্তিতে নয়।

সব ধরণের বৈজ্ঞানিক পরিমাপকে চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধানের উপযোগীতার ভিত্তিতে বিচার করা উচিৎ, নিরঙ্কুশ সত্যের ভিত্তিতে নয়। একজন রসায়নবিদ যেমন একটি উপাদানকে নিরঙ্কুশভাবে কঠিন বলে বর্ণনা করতে পারবেন না, তেমনিভাবে একজন সামাজিক বিজ্ঞানী একজন মানুষকে নিরঙ্কুশভাবে ধার্মিক বলে অভিহিত করতে পারেন না। একজন ব্যক্তির ধার্মিকতা, বা কোন উপাদানের কঠিনতার অর্থটি কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তি বা উপাদানের প্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। এটি অভিযোগ তোলা হয় যে, সামাজিক বিজ্ঞানীরা ক্রমাগতভাবে তাদের চলকসমূহের পরিমাপকে সংশোধন করেন এবং দু'জন

সামাজিক বিজ্ঞানী একই সময়ে পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু এটিও শুধুমাত্র সামাজিক বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বিজ্ঞানের মুক্ত দ্বার বৈশিষ্ট্যটি সবসময় ক্রমাগত পরিবর্তনকে আহবান করে।

সামাজিক সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার (Discovering Social Regularities)

সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে বেশী নিয়মবদ্ধ বলে বিবেচনা করার একটি প্রবণতা রয়েছে। যেমন, আমরা জেনেছি যে, যত বার একটি ভারী বস্তুকে ছুঁড়ে মারা হবে, তত বার সেই বস্তুটি পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পড়বে। কিন্তু একজন মানুষ একটি নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে ভোট দিলেও অন্য নির্বাচনে তার বিরোধীতা করতে পারেন। একইভাবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বরফ সবসময় গলতে থাকে, কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে ধর্মীয় বলে প্রতিয়মান একজন মানুষ নিয়মিতভাবে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ নাও করতে পারেন। এ ধরণের বিষয় উলে- খ করে বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এভাবে সামাজিক সাধারণ নিয়মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ফলে এক ধরণের বিপদ তৈরি হতে পারে। সমাজের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু সামাজিক নিয়মকে নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, একটি নির্দিষ্ট বয়সেই কেবলমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব, পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই সাধারণতঃ পরিবার গঠন করা হয়, ইত্যাদি। এ ধরণের আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানগুলো মানুষের আচরণকে পরিচালিত করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে রীতিসিদ্ধ নিয়মাবলীর বাইরেও অনেক রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। যেমন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একজন শ্রমিকের তুলনায় বেশী আয় করে থাকেন, নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশী ধার্মিক হয়ে থাকেন, ইত্যাদি। এ ধরণের সাধারণ নিয়মের বর্ণনাকে সাধারণতঃ তিন ধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। *প্রথমতঃ*, এ ধরণের সাধারণ নিয়ম বর্ণনার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। কারণ, এগুলো আমরা সবাই জানি। *দ্বিতীয়তঃ*, পর্যবেক্ষণ পুরোপুরি সত্য না হবার ফলে পরস্পর বিরোধী ফলাফলের জন্ম হতে পারে। *তৃতীয়তঃ*, মানুষ যদি ইচ্ছা করে, তাহলে তার ঐচ্ছিক আচরণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকৃত সাধারণ নিয়মকে ভুল বলে প্রমাণিত করতে পারে।

প্রথম সমালোচনাটির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আমরা সবাই যা জানি, তার বর্ণনা এবং উপস্থাপন যে কোন বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তা প্রাকৃতিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন। যে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের বিরুদ্ধে এটি কোন কার্যকর সমালোচনা হতে পারে না। ডারউইন তার অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে শ্লেষ করে 'Fool's Experiment' পদটিকে ব্যবহার করেছেন। কারণ, সবসময় তাঁর মনে হয়েছে যে, তিনি যা করছেন তা সম্ভবতঃ সবার জানা। তিনি বোধ হয় নতুন কিছু বলছেন না।

দ্বিতীয় সমালোচনাটিও যথাযথ নয়। কারণ, সামাজিক সাধারণ নিয়ম একটি সম্ভাবনামূলক রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। দু'টি চলকের মধ্যে যে সাধারণ সম্পর্ক রয়েছে তা একশ ভাগ সত্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও এ ধরণের সমালোচনার বাহিরে নয়। যেমন, বংশগতি বিষয়ক বিজ্ঞান (genetics) অনুযায়ী একজন নীল চোখসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে একজন বাদামী চোখসম্পন্ন ব্যক্তির মিলনের ফলে একজন বাদামী চোখসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, তার পরিবর্তে যদি একজন নীল চোখসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়, তাতে করে পর্যবেক্ষণগত বা পর্যবেক্ষণকৃত সাধারণ নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করা হয় না। কারণ, বংশগতি বিষয়ক বিজ্ঞানীরা সম্ভাবনার আকারে বলে থাকেন যে, একজন নীল চোখসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে একজন বাদামী চোখসম্পন্ন ব্যক্তির মিলনের ফলে একজন বাদামী চোখসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম নেবার সম্ভাবনা বেশী। একইভাবে, একজন সামাজিক বিজ্ঞানী সম্ভাবনার আকারে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশী ধার্মিক হতে পারেন এবং যথাযথ পরিমাপ পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে তিনি এর শতকরা হারটিও নির্ণয় করে দেখাতে পারেন।

তৃতীয় সমালোচনাটির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এ ধরণের সমান্তরাল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে না, তবুও সমালোচনাটি যথাযথ নয়। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একজন

মের অস্তিত্ব বাস্তবে
সামাজিক বিজ্ঞানী
ক পর্যবেক্ষণ করতে
খন দীর্ঘ সময় পরে
য়ম পরিবর্তিত হয়,
াজিক বিজ্ঞানী সেই
গুলোকে পর্যবেক্ষণ
খ্যা করতে পারেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভোটের আচরণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীটি নাকচ করে দেবার জন্য ভোটাররা ভিন্ন আচরণ করতে পারেন। কিন্তু এ ধরণের ঘটনা যথেষ্ট নিয়মিতভাবে ঘটে না বলে তা সামাজিক সাধারণ নিয়মের পর্যবেক্ষণকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক নিয়মের অস্তিত্ব বাস্তবে রয়েছে এবং সামাজিক বিজ্ঞানী সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। যখন দীর্ঘ সময় পরে সামাজিক নিয়ম পরিবর্তিত হয়, তখন সামাজিক বিজ্ঞানী সেই পরিবর্তনগুলোকে পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন।

সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ (Origin and Development of Social Theories)

বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণেও সামাজিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

এটি সত্য যে, এখন পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিকশিত তত্ত্বের সমমানের তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন নি। সামাজিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব রয়েছে, যা পর্যাপ্ত বলে সমর্থিত হয় নি। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এমন অনেক তত্ত্ব রয়েছে, যা বর্তমানে অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো মর্যাদাসম্পন্ন তত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞানে না থাকার দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। *প্রথমতঃ*, প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে যতদিন ধরে সুসংবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে আসছে, সামাজিক আচরণকে গবেষণার ক্ষেত্রে সেগুলো ততদিন ধরে ব্যবহার করা হয়নি। *দ্বিতীয়তঃ*, সামাজিক আচরণকে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করা যাবে না বলে যে ধারণাটি প্রচলিত ছিল, তা সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কৌশলের আবিষ্কারকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। উপরন্তু, বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণেও সামাজিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার পরিবর্তে বিজ্ঞানের সনাতনী উপস্থাপনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেবার কারণেই এটি ঘটেছে। সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান কি না, বা সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যাবে কি না সেটি বুঝতে হলে সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি তা জানা প্রয়োজন এবং বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য (Goals of Social Science)

সামাজিক বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হলো, যে কোন বিষয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের জন্ম দেয়া।

সামাজিক বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হলো, যে কোন বিষয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের জন্ম দেয়া। আমরা যে সকল বিষয়ে আগ্রহী, সে সকল অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী এবং উপলব্ধিতে সেই জ্ঞান আমাদের সাহায্য করবে। প্রশ্ন হলো, এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কি অবদান রাখতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? কখন আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি? এবং কখন আমরা যথাযথভাবে দাবী করতে পারি যে, আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চকে উপলব্ধি করতে পারি?

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা (Scientific Explanation): যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষ অপরাধ করে কেন? কেউ বলতে পারেন যে, 'কিছু মানুষ খারাপ বলে তারা অপরাধ করতে চায়।' এ ধরণের ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করলেও সামাজিক বিজ্ঞানীর জন্য এটি যথেষ্ট নয়। কারণ, কেন মানুষ বিশেষ ধরণের আচরণ করে, বা করে না, তার ব্যাখ্যাটি যখন সামাজিক বিজ্ঞানীরা জানতে চান, তখন তারা মূলতঃ আচরণটি কেন ঘটে, বা ঘটে না, তার জন্য দায়ী পূর্ববর্তী কারণগুলোর প্রণালীবদ্ধ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণ করতে চান। অর্থাৎ, সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে একটি প্রপঞ্চকে অন্য প্রপঞ্চের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই হলো সামাজিক বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। যে বিজ্ঞান বিকাশের যত উচ্চ পর্যায়ের হবে, সেই বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলো ততবেশী উন্নত মানের হবে। যে বিজ্ঞান বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে থাকে, সেই বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলো কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেণীবদ্ধকরণের মাত্রায় থাকে। বিজ্ঞানের বিকাশের মাত্রার সাথে সাথে ব্যাখ্যার মাত্রাও পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাগুলো যে মাত্রায় সাধারণীকরণ প্রদান করে তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যার দু'টি প্রকরণ রয়েছে: অবরোহীমূলক ব্যাখ্যা এবং সম্ভাবনামূলক বা আরোহীমূলক ব্যাখ্যা।

অবরোহী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন নিয়ম থেকে আহরিত অনুমানের মাধ্যমে একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়।

অবরোহী ব্যাখ্যার জন্য সার্বজনীন সাধারণীকরণ, যে পরিস্থিতিতে সাধারণীকরণগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হবে তার বর্ণনা, বর্ণনাযোগ্য ঘটনা এবং আনুষ্ঠানিক যুক্তির নিয়ম প্রয়োজন। অবরোহী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন নিয়ম থেকে আহরিত অনুমানের মাধ্যমে একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, একটি বস্তু শূন্যে ছুঁড়ে দিলে তা আবার ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাবে মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের ভিত্তিতে। সার্বজনীন নিয়মের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তটি হলো যে, এটি এর অধীনে অধীত সব বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। অবরোহী যুক্তিবিন্যাসে, যুক্তির ভিত্তিটি উপসংহারে পৌঁছানোর দিক নির্দেশ করে। অর্থাৎ, ভিত্তিটি যদি সত্য হয়, তবে উপসংহার সত্য হতে বাধ্য। যদি ভিত্তিটি সত্য না হয়, তবে উপসংহারও সত্য হবে না।

কিন্তু সব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সার্বজনীন নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ বক্তব্যটি সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, সামাজিক বিজ্ঞানে খুব কমই অর্থবহ সর্বজনীন সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয়। সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ সম্ভাবনামূলক বা আরোহী ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করে থাকে। যেমন, কোন এক বছরের সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে যে, দেশের সংকটাপন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে কৃষি ও শিল্পখাতে ভর্তুকী প্রদান করা হয়েছে বলে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এই ব্যাখ্যাটি যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে হবে (সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি) তা পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে যুক্ত করেছে (দেশের অর্থনৈতিক সংকট)। এই সম্পর্কটিকে একটি সর্বজনীন নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, সব ধরণের অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রেই ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় করা হয় না। এ ক্ষেত্রে যা বলা যায় তা হলো, যে সকল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সকল পরিস্থিতির অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন অবস্থায় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরণের সাধারণ ব্যাখ্যাকে সম্ভাবনামূলক বা আরোহীমূলক ব্যাখ্যা বলা হয় এবং এগুলো সম্ভাবনামূলক সাধারণীকরণ থেকে আহরিত হয়। কিন্তু সার্বজনীন নিয়মের তুলনায় আরোহী বা সম্ভাবনামূলক সাধারণীকরণের প্রধান সমস্যাটি হলো যে, নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট উপসংহার টানা যায় না। কারণ, একটি ঘটনার পিছনে একের অধিক কারণ থাকে, যার সবগুলোই গবেষকের জানা থাকে না।

ভবিষ্যদ্বাণীকরণ (Prediction): সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারার ক্ষমতা যে কোন বিজ্ঞানের জন্য একটি বিশিষ্ট গুণ। কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে ভবিষ্যদ্বাণীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, যদি জানা থাকে যে, অর্থনৈতিক সংকটের সময় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তবে একজন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সংকটের সময় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে, যদি জানা থাকে যে, গ্রামে গ্রামে যুব উন্নয়ন ক্লাব গড়ে তোলার মাধ্যমে যুবকদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে অপরাধের মাত্রা অনেক কমে যায়, তবে সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে যে, যুব উন্নয়ন ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অপরাধের মাত্রা কমবে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী জন্ম দেবার যে প্রত্যাশা, তা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে যে, যদি এটি জানা থাকে যে, 'খ' ঘটবার পিছনে 'ক' কারণ হিসাবে কাজ করেছে এবং কোন পরিস্থিতিতে 'ক'-এর উপস্থিতি যদি বিদ্যমান হয়, তবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে যে, 'খ' ঘটবে। এই যুক্তিটির অন্তর্নিহিত ধারণাটি হলো যে, যদি একটি সার্বজনীন নিয়ম অথবা সম্ভাবনামূলক সাধারণীকরণ জানা থাকে এবং সত্য হয় (অর্থাৎ, ফলাফলকে ভবিষ্যদ্বাণীকরণের জন্য যদি পূর্ববর্তী অবস্থাটি যথেষ্ট হয়), তবে ভবিষ্যদ্বাণীটি ব্যর্থ হবার কারণটি হতে পারে, হয় সার্বজনীন নিয়ম বা সম্ভাবনামূলক সাধারণীকরণটি সত্য নয়, নতুবা পূর্ববর্তী অবস্থাটিকে ভুলভাবে অনুমান করা হয়েছে।

উপলব্ধি (Understanding): বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো উপলব্ধি। উপলব্ধি শব্দটির অর্থ মৌলিকভাবে দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হলো Verstehen বা empathic উপলব্ধি এবং অন্যটি ব্যবহৃত হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপলব্ধিগত অর্থে। দু'টি কারণে এই ভিন্ন ব্যবহারের বিকাশ ঘটেছে – *প্রথমতঃ*, সামাজিক বিজ্ঞান একই সাথে মানবতাবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত বলে, এবং *দ্বিতীয়তঃ*, সামাজিক বিজ্ঞানী একাধারে পর্যবেক্ষণকারী ও অংশগ্রহণকারী বলে। এ কারণেই প্রশ্ন উঠেছে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনুসৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে কি মানব

আচরণের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা যায়? মানব আচরণের জটিলতা এবং অনন্যতার কারণে কি সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য ভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে? সামাজিক বিজ্ঞানীকে কি তাদের বিষয়বস্তুকে বোঝার জন্য সেগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকতে হবে? Verstehen পদ্ধতি অনুযায়ী মনে করা হয় যে, বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈচিত্রের কারণে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের দু'টি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে ভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ। কেননা, সামাজিক বিজ্ঞানীকে মানব আচরণের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং মানব অভিজ্ঞতার আত্মগত বিষয়কে অনুধাবন করা প্রয়োজন। Verstehen পদ্ধতির প্রবক্তা ম্যাক্স ভেবারের মতে, যদি সামাজিক বিজ্ঞানীকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকে উপলব্ধি করতে হয়, তবে তাদের অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে হবে। তাদের অবশ্যই বাস্তবতা সম্পর্কে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করতে হবে।

Verstehen পদ্ধতির বিপরীতে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপলব্ধির ঐতিহ্য ধরে যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা (logical empiricists) মনে করেন যে, সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতার অনুসন্ধানে একই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। অর্থাৎ, একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে অধ্যয়ন করা সম্ভব। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা Verstehen পদ্ধতিকে আবিষ্কারের একটি সহায়ক কৌশল হিসাবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু আবিষ্কারগুলোকে যদি বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, তবে সেগুলোকে অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে।

সারাংশ

সামাজিক গবেষণার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন। বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ হলো পরিমাপ এবং নিয়মবদ্ধ পর্যবেক্ষণ। এই পাঠে আমরা সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে মানুষের আচরণ, আচরণের বিভিন্ন দিক এবং আচরণ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা কাজ করে থাকে। এ ছাড়াও, সামাগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এবং এর সাথে সামাজিক গবেষণার সম্পর্ক কিভাবে কাজ করে তাও আমরা আলোচনা করেছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। সামাজিক বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হচ্ছে:

ক. একটি প্রপঞ্চকে বর্ণনা করা
খ. একটি প্রপঞ্চের সাথে অন্য প্রপঞ্চের তুলনা করা
গ. একটি প্রপঞ্চকে অন্য প্রপঞ্চের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা
ঘ. উপরের সব।

২। বিজ্ঞান চর্চা হলো:

ক. আদর্শ এবং সম্ভাব্য বাস্তবতার মধ্যে একটি সমন্বয়
খ. আদর্শ ধারণার পরীক্ষা নিরীক্ষা
গ. আদর্শ ধারণাকে অতি-আদর্শে রূপান্তর করা
ঘ. বাস্তব এবং অতিবাস্তবের সম্পর্ক পরিমাপ করা।

৩। 'বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈচিত্রের কারণে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানকে দু'টি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ' — কোন পদ্ধতি অনুযায়ী?

ক. মার্কসীয় পদ্ধতি অনযায়ী
খ. তুলনামূলক পদ্ধতি অনুযায়ী
গ. Verstehen পদ্ধতি অনুযায়ী
ঘ. ক্রিয়াবাদী পদ্ধতি অনুযায়ী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য কী?

২। সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'সামাজিক বিজ্ঞান কী বিজ্ঞান?' – আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দিন।

২। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য
Characterties of Science and Social Science

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য
- সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য
- বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে তুলনা

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Science)

বিজ্ঞান যৌক্তিক যুক্তিবিন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান যৌক্তিক (Science is Logical): বিজ্ঞান মৌলিকভাবে একটি যৌক্তিক কর্মকান্ড। কারণ, বিজ্ঞান যৌক্তিক যুক্তিবিন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন একটি ঘটনা, যা অন্য একটি ঘটনার পূর্বে ঘটেছে, তা সেই ঘটনার ফলাফল হতে পারে না। যেমন, 'ক' যদি 'খ'-এর পূর্বে ঘটে এবং 'খ' যদি 'গ'-এর পূর্বে ঘটে, তবে 'গ' 'খ' কিংবা 'ক'-এর পূর্বে ঘটতে পারে না। বিজ্ঞানের যুক্তিতে, একটি বস্তু একই সাথে দু'টি ফলাফল প্রদান করতে পারে না। যেমন, একটি মুদ্রা ছুঁড়ে দিলে মাথা এবং লেজ একই সাথে আসতে পারে না। হয় মাথা আসবে, নতুবা লেজ আসবে। একজন ব্যক্তি একই সাথে ধনী এবং দরিদ্র হতে পারে না। বিজ্ঞানসম্মত কর্মকান্ডে আরোহী এবং অবরোহী দু' ধরণের যুক্তি বিদ্যমান। অবরোহী যুক্তির মাধ্যমে কোন তত্ত্ব থেকে আহরিত অনুকল্প পরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান নির্ধারণমূলক (Science is Deterministic): বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি হলো কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণা। কোন কিছু এমনিতেই ঘটে না। প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোন কারণ থাকে বলেই তা ঘটে। যখন কোন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়, যখন বৃষ্টি হয়, যখন কেউ কাঁদে, তখন বিজ্ঞানী ধারণা করেন যে, প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোন না কোন কারণ রয়েছে। কোন কিছুই পূর্ববর্তী কারণ ছাড়া ঘটে না। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানী ঘটমান সকল ঘটনার কারণ জানেন না, এমনকি জানার ভানও করেন না। তবে, তিনি কারণগুলোর অস্তিত্বকে অনুমান করেন এবং এও ধারণা করেন যে, সেগুলো নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন, একজন ব্যক্তি যখন তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে একটি বিশেষ প্রার্থী বা দলকে ভোট দেন, তখন তার পিছনে একটি বা অনেক কারণ থাকতে পারে। দু'জন ব্যক্তি একই প্রার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভোট দিতে পারেন। অর্থাৎ, বিজ্ঞানী বহু-কারণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে থাকেন, এক-কারণ ভিত্তিক নয়। যেহেতু বিজ্ঞানী সব কারণ জানেন না এবং একই ঘটনার পিছনে বহু কারণ বিদ্যমান থাকে, সেহেতু সব বিজ্ঞানে নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধতায় কার্য-কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।

অংশকে অবশ্যই বিজ্ঞানী বুঝতে চান, তবে তার মূল লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণকে বোঝা।

বিজ্ঞান সাধারণ (Science is General): কোন একটি বিশেষ ঘটনা বিশ্লেষণের পরিবর্তে সমস্যার সাধারণ ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। যেমন, একটি পাথরের নুড়ি কেন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে বরং সব নুড়ি কেন গড়িয়ে পড়ে, বিজ্ঞানী প্রধানতঃ সেই ব্যাখ্যাই খুঁজে পেতে বেশী আগ্রহী হন। অংশকে অবশ্যই বিজ্ঞানী বুঝতে চান, তবে তার মূল লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণকে বোঝা। বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যটি সম্ভাবনামূলক নির্ধারণের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাধারণীকরণই হলো বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য, সেহেতু বিজ্ঞানী স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ ঘটনার পরিবর্তে সাধারণ উপলব্ধির প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন।

বিজ্ঞান সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য (Science is Parsimonious): কোন ঘটনাকে নির্ধারণ করে এমন কারণগুলো আবিষ্কারের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। পাশাপাশি, যে কারণগুলো ঘটনাটিকে নির্ধারণ করে না সেগুলো আবিষ্কারেও তিনি সচেষ্ট হন। এটি করতে গিয়ে তিনি যতটুকু সম্ভব কম সংখ্যক ব্যাখ্যাযোগ্য উপাদানকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। এটি ঠিক যে, বেশী সংখ্যক উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করলে নির্ধারণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যেমন, একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভোটের আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, দলের প্রতি আনুগত্য ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান, এ দু'টো উপাদান দিয়ে যতটুকু নির্ধারণের মাত্রা অর্জন করবেন, নিঃসন্দেহে আরেকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাসস্থান, লিঙ্গ, শিক্ষা, বর্ণ, গোষ্ঠী, ইত্যাদি উপাদান দিয়ে আরো বেশী নির্ধারণের মাত্রা অর্জন করতে পারবেন। তবে প্রশ্ন হলো, যে সকল নতুন উপাদান যুক্ত করা হয়েছে তার মাধ্যমে নির্ধারণের মাত্রা কতটুকু বৃদ্ধি পেল তা গুরুত্বপূর্ণ। যদি দেখা যায় যে, চারটি অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করার ফলে নির্ধারণের মাত্রা মাত্র দুই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি তার ব্যাখ্যায় ঐ চারটি উপাদান রাখবেন কি না। এ সিদ্ধান্তটি নির্ভর করে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর। একটি হলো ব্যাখ্যার সারল্য এবং অন্যটি হলো ব্যাখ্যার মাত্রা। অনেক সময় বিজ্ঞানী দুই শতাংশ অতিরিক্ত ব্যাখ্যার মাত্রার চেয়ে ব্যাখ্যার সারল্যকে প্রাধান্য দেন। আবার কখনো কখনো বিজ্ঞানীর কাছে ব্যাখ্যার মাত্রা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু ব্যাখ্যার মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাখ্যার জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। এই দু'টো বিষয়ের সমন্বয় করতে পারাই একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর সাফল্যকে চিহ্নিত করে।

বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট (Science is Specific): আমরা পূর্বে জেনেছি যে, বিজ্ঞান কোন ঘটনার সুনির্দিষ্ট বিষয়কে জানার চেয়ে সাধারণভাবে বিষয়ের সামগ্রিক দিকটিকে জানার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা এও জানি যে, অধিকাংশ প্রত্যয়েরই বিভিন্ন রকম কার্যকর সংজ্ঞা রয়েছে। কাজেই, যখন একজন সামাজিক বিজ্ঞানী রক্ষণশীলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চান, তখন তাকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে, রক্ষণশীলতার বহু মাত্রা রয়েছে। গবেষককে অবশ্যই রক্ষণশীলতা প্রত্যয়টির একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকর সংজ্ঞায়ন করতে হবে। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের সময় সর্তকতার সাথে সেই কার্যকর সংজ্ঞায়নের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে, যাতে করে প্রত্যয়টি কিভাবে পরিমাপ করা হয়েছে পাঠক তা বুঝতে পারেন। এতে করে পাঠক তার কার্যকর সংজ্ঞায়নের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও তিনি জানবেন যে, গবেষক বিষয়টি উপস্থাপন করতে গিয়ে কি বলতে চেয়েছেন।

যে কোন তত্ত্ব তখনই ব্যবহারোপযোগী হয়ে উঠবে, যখন সেই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে এবং কিভাবে সংগৃহীত উপাত্ত বিশে- ষণ করে তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে, তার পদ্ধতি নির্দেশ করে।

বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পরীক্ষাযোগ্য (Science is Empirically Verifiable): বিজ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফলগুলো বিভিন্ন তত্ত্ব এবং সমীকরণের মাধ্যমে আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে বর্ণনা করে। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব এবং সমীকরণ ততক্ষণ উপযোগী হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ না সেগুলোকে উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে কোন তত্ত্ব তখনই ব্যবহারোপযোগী হয়ে উঠবে, যখন সেই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে এবং কিভাবে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে, তার পদ্ধতি নির্দেশ করে। বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র তত্ত্বের যথার্থতাকেই প্রমাণ করে না, তত্ত্ব কিভাবে ভুল প্রমাণিত হবে তাও বলে দেয়। যেমন, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানি যে, ভৌত পদার্থগুলোর মধ্যে একটি আকর্ষণ থাকার কারণে যে কোন বস্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং আকর্ষণের এই সম্পর্কটি নির্ভর করে বস্তুর আকারগত পরিমাণের উপর। যেহেতু পৃথিবী একটি বড় আকারের বস্তু, সেহেতু একটি বল ছুঁড়ে দিলে পৃথিবী পৃষ্ঠেই এসে পড়ে। এ বিষয়টি অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পরীক্ষাযোগ্য। একজন গবেষক একটি বল ছুঁড়ে দিলেই দেখবেন যে, সেটি মাটিতে এসে পড়ছে। কিন্তু যদি বলটি পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে না পড়ে, তবে প্রমাণিত হবে যে, তত্ত্বটি সঠিক নয়। অর্থাৎ, যখন আমরা বলি যে, একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে অবশ্যই পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে, তখন আমরা বোঝাই যে, তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য শর্তগুলো গবেষক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেবেন। যখন গবেষক উপর্যুপরি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন, তখন তিনি অধিকতর নিশ্চিত হবেন যে তাঁর তত্ত্বটি নির্ভুল।

ক প্রতিষ্ঠিত করতে জ্ঞানের আন্তভাবগত টিকে অর্জন করতে হবে।

বিজ্ঞান আন্তভাবগত (Science is Intersubjective): এটি প্রায়শঃ খুব দৃঢ়তার সাথে বলা হয় যে, বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু এ ধরণের দৃঢ় ঘোষণা বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উদ্রেক করে। কারণ,

কোন বিজ্ঞানীই পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন না। প্রতিটি বিজ্ঞানীই তার নিজের ব্যক্তিগত প্রেষণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন না কোনভাবে ভাববাদী হন। যখন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দু'জন বিজ্ঞানী একটি গবেষণা পরিচালনা করে একই উপসংহারে পৌঁছবেন, তখন বিজ্ঞানের আন্তভাবগত বৈশিষ্ট্যটির অর্থ প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, একজন বিজ্ঞানী যদি একটি প্রত্যয়কে সংজ্ঞায়িত করেন এবং সকল বিজ্ঞানী তা বুঝতে পারেন, তখনই কেবলমাত্র প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায়শঃ মতের ভিন্নতা ঘটে এবং এই ভিন্নতাগুলো সাধারণতঃ প্রত্যয়ের কার্যকর সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপ প্রক্রিয়ার মধ্যে হয়ে থাকে। ভিন্ন মত পোষণকারী বিজ্ঞানী যদি গবেষণাটিকে পুনরায় পরিচালনা করেন এবং একই ফলাফল পান, তখন মতদ্বৈততা দূর হয়। এটিই হলো বিজ্ঞানের আন্তভাবগত বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানী যখন বস্তুনিষ্ঠতার শর্তগুলো আরোপ করেন, তখন তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত মানদন্ড দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করেন। যেহেতু তিনি নিজেও একজন ব্যক্তি-মানুষ, সেহেতু সেখানে ভাবগত পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তার প্রভাব পড়ে। কাজেই, বস্তুনিষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিজ্ঞানের আন্তভাবগত বৈশিষ্ট্যটিকে অর্জন করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে তার সঠিকতা বা নির্ভুলতার ভিত্তিতে বিচার করা উচিৎ নয়, বরং তা হওয়া উচিৎ আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে বোঝার জন্য তা কতটুকু উপযোগী তার ভিত্তিতে।

বিজ্ঞান পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত (Science is Open to Modification): এতক্ষণে এটি বোঝা গিয়েছে যে, সত্যের অনুসন্ধানে বিজ্ঞান কোন সহজ পথ নির্দেশ করে না। পূর্বে উলি- খিত সব বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে দু'জন বিজ্ঞানী একই প্রপঞ্চ সম্পর্কে পুরোপুরি ভিন্ন ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারেন। একটি বিশেষ সময়ে এ দু'টি ব্যাখ্যার তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করার কোন পথ হয়তো থাকবে না। যদি দু'টি ব্যাখ্যা পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তবে অনুমান করতে হবে যে, দু'টোই একসাথে সঠিক নয়, যে কোন একটি ভুল। এ রকম বহু তত্ত্ব পরবর্তী সময়ে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং উন্নততর তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে তার সঠিকতা বা নির্ভুলতার ভিত্তিতে বিচার করা উচিৎ নয়, বরং তা হওয়া উচিৎ আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে বোঝার জন্য তা কতটুকু উপযোগী তার ভিত্তিতে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Science)

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যটি হলো সামাজিক আচরণকে যৌক্তিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করা।

সামাজিক বিজ্ঞান যৌক্তিক (Social Science is Logical): সামাজিক বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যটি হলো সামাজিক আচরণকে যৌক্তিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করা। এর অর্থ এই নয় যে, সব সামাজিক আচরণই যৌক্তিক। কিছু সামাজিক আচরণ রয়েছে, যা যুক্তিহীন এবং কিছু রয়েছে, যা অযৌক্তিক। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানী সব ধরণের আচরণ বোঝার জন্য তুলনামূলকভাবে যৌক্তিক হয়ে থাকেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞানীও একই রকম যুক্তিবিন্যাসের প্রতিবন্ধকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেমন, যে ঘটনাটি পরের ঘটনাটির কারণ, সেটিকে পূর্বেই ঘটতে হবে, পরে নয়। একই সাথে একটি ঘটনার দু'টি ফলাফল ঘটতে পারে না। সামাজিক বিজ্ঞানেও অবরোহী এবং আরোহী যুক্তির যথাযথ ব্যবহার হয়ে থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞান নির্ধারণমূলক (Social Science is Deterministic): প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর মতো সামাজিক বিজ্ঞানীও এ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যে কোন ঘটনার পিছনে কোন না কোন কারণ রয়েছে। কোন ঘটনাই শুধু শুধু এমনিতেই ঘটে না। প্রতিটি ঘটনার পূর্বে একটি ঘটনা কারণ হিসাবে কাজ করে। যেমন, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রক্ষণশীলতা বা উদারনৈতিকতার মাত্রাটি নির্ভর করে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর। সামাজিক বিজ্ঞানের নির্ধারণমূলক বৈশিষ্ট্যটি সামাজিক আচরণের মানবতামূলক ব্যাখ্যার বিপরীতে অবস্থান করে। মানবতামূলক বিবেচনাটি যে কোন কর্মকান্ডের ভাবগত আচরণকে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, নির্ধারণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি একটি বস্তুগত বিশ্লেষণের উপর বিবেচিত হয়। যেখানে একজন মানবতাবাদী যুক্তি দেবেন যে, একটি স্বভাবজাত প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে মানুষ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে, সেখানে সামাজিক বিজ্ঞানী বলবেন যে, এটি একটি সাধারণ রূপের ফলাফল।

সামাজিক বিজ্ঞান সাধারণ (Social Science is General): সামাজিক বিজ্ঞান কোন ঘটনা বা প্রপঞ্চের সামগ্রিক রূপ এবং সম্পর্ককে বোঝার জন্য সচেষ্ট হয়। সাধারণীকরণের মাধ্যমেই একটি

*যদিও সামাজিক বি
পরিধির সামাজিক
জনগোষ্ঠীর একটি
অংশের ব্যাখ্যা দি
করেন, শেষ পর্যন্ত
থাকে তার ফলাফ
প্রসারিত করে বৃহত্ত
জনগোষ্ঠীর অন্যান*

সামাজিক তত্ত্ব বা সামাজিক সহসম্পর্কের উপযোগীতা বৃদ্ধি পায়। একটি তত্ত্ব একটি সামাজিক প্রপঞ্চের যত ব্যাপক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবে, সেটি তত বেশী উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। অতএব, ভোটের আচরণের একটি অনুমান যদি যুব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য হয়, তবে তা বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে তেমন উপযোগী নাও হতে পারে। একইভাবে, ধর্মনিষ্ঠতার একটি তত্ত্ব খ্রীষ্টানদের প্রতি প্রযোজ্য হলে তা মুসলমানদের প্রতি তেমন উপযোগী হবে না। যদিও সামাজিক বিজ্ঞানী সীমিত পরিধির সামাজিক আচরণ, বা জনগোষ্ঠীর একটি সীমিত অংশের ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেন, শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্যটি থাকে তার ফলাফলের ব্যাখ্যাকে প্রসারিত করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্যান্য আচরণকেও ব্যাখ্যা করা।

সামাজিক বিজ্ঞান সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য (Social Science is Parsimonious): প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর মতো সামাজিক বিজ্ঞানীও কোন বিষয়কে অল্প সংখ্যক চলকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হন। অনেক ক্ষেত্রেই, নতুন চলকের সংযোজন ব্যাখ্যার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে বটে, তবে তা তার ব্যাখ্যাকে অনেকটা জটিলও করে তোলে। বস্তুতঃপক্ষে, অধিক চলকের সংযোজন প্রায়ই ব্যাখ্যার সাধারণীকরণকে ব্যাহত করে। কারণ, কিছু চলক একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর এক ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে, এবং অন্য জনগোষ্ঠীর উপর ভিন্ন প্রভাব ফেলতে পারে। এটি উলে- খ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন পন্ডিতদের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ, মানবতাবাদীরা যুক্তি তোলেন যে, কোন প্রপঞ্চকে তিনটি বা চারটি চলকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করলে সেই ব্যাখ্যাটি সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নাও হতে পারে। কারণ, সেই প্রপঞ্চের পিছনে আরো অনেক চলক ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। আমরা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় উলে- খ করেছি যে, যদি বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হয় ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতা ও সারল্য, তাহলে অল্পসংখ্যক চলক নির্বাচন হবে গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি লক্ষ্যটি হয় ব্যাখ্যার ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি, তবে অধিকসংখ্যক চলকের সংযোজন হবে যথোপযুক্ত।

সামাজিক বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট (Social Science is Specific): প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর মতো সামাজিক বিজ্ঞানীও তার পরিমাপের পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট করতে চান। সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদানের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সামাজিক বিজ্ঞানীরা এমন সব প্রত্যয় ব্যবহার করেন যা অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত থাকে। যেমন, ধর্মনিষ্ঠতা, রক্ষণশীলতা, বিশ্বাস ও আচার, ইত্যাদি। যখন একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী গতিকে খুব সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, তখন তা বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ অনুধাবনের চেয়ে খুব বেশী ভিন্ন হয় না। কিন্তু যখন সামাজিক বিজ্ঞানী ধর্মনিষ্ঠতা এবং রক্ষণশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করেন, তখন সাধারণ ভাষায় প্রচলিত সংজ্ঞা এবং সূক্ষ্মভাবে প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলোকে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কমিয়ে আনতে চেষ্টা করেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর মতো সামাজিক বিজ্ঞানীও তার পরিমাপের পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট করতে চান।

সামাজিক বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পরীক্ষাযোগ্য (Social Science is Empirically Verifiable): সামাজিক বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা এবং তত্ত্বগুলোকে ব্যবহারযোগ্য হতে হলে এগুলোকে বাস্তব জগতে পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে। শুধুমাত্র এমন বক্তব্য উপস্থাপন করলেই চলবে না যে, ধার্মিকতার সাথে রক্ষণশীলতার একটি ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত দু'টি চলক কিভাবে পরিমাপ এবং পরীক্ষা করা হবে তার পদ্ধতিকেও নির্দেশ করতে হবে। যে পরিস্থিতিতে একটি প্রদত্ত প্রস্তাবনা ভুল বলে প্রমাণিত হবে, সেই অভিজ্ঞতার যোগ্য পরিস্থিতিটিকে বর্ণনার ক্ষমতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞানীরও থাকতে হবে। কি পদ্ধতিতে এটিকে ভুল বলে প্রমাণ করা যাবে তারও বিশদ বর্ণনা থাকতে হবে। যেমন, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে যেমন পর্যবেক্ষণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় না, তেমনি একটি বিশেষ ধর্ম বা বর্ণের জনগোষ্ঠী তাদের বিশ্বাসের অনুশাসনগুলো অনুশীলন করলেও মনে প্রাণে সেগুলো তারা বিশ্বাস করেন না এমন বক্তব্যকেও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায় না। অতএব, অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষার জন্য সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর বর্ণনার সাথে সাথে সেগুলোর পরিমাপ ও পরীক্ষা পদ্ধতির বিশদ বিবরণ থাকতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা এবং তত্ত্বগুলোকে ব্যবহারযোগ্য হতে হলে এগুলোকে বাস্তব জগতে পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে।

একটি সামাজিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে যে মাত্রায় পর্যাপ্তভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণনা করা হবে, অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদেরও একই মাত্রায় সেই পদ্ধতিকে উপলব্ধি করে একই রকম ফলাফল প্রাপ্তির জন্য পুনরায় পরীক্ষাটি পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞান আন্তভাবগত (Social Science is Intersubjective): একটি সামাজিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে যে মাত্রায় পর্যাপ্তভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণনা করা হবে, অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদেরও একই মাত্রায় সেই পদ্ধতিকে উপলব্ধি করে একই রকম ফলাফল প্রাপ্তির জন্য পুনরায় পরীক্ষাটি পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণিত হয় নি এবং একজন সামাজিক বিজ্ঞানী থেকে অন্য সামাজিক বিজ্ঞানীর মধ্যে ধারণাটির আদান প্রদান ঘটে নি। অনেক সামাজিক গবেষণায়, এ ধরণের যোগাযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল, এমন কি, পরস্পর বিরোধী ফলাফলও পেয়ে থাকেন। মূল কথাটি হলো, গবেষণাকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হলে এর প্রত্যয়, পরিমাপ, পদ্ধতির আন্তভাবগত যোগাযোগটি স্থাপিত হতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেতে হলে প্রচলিত ধারণা এবং বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞান পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত (Social Science is Open to Modification): কোন সামাজিক তত্ত্বই অনির্দিষ্টকাল ধরে টিকে থাকে না। কারণ, সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে সামাজিক আচরণও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন তত্ত্ব উন্মোচিত হয়, যার উপর ভিত্তি করে নতুন ব্যাখ্যা তৈরি হয়। কার্যতঃ, সামাজিক বিজ্ঞান অনেক প্রপঞ্চ নিয়ে কাজ করে, যা রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সামাজিক দর্শন এবং মূল্যবোধগুলো বিজ্ঞানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কম পরিবর্তনশীল। যখন একজন সামাজিক বিজ্ঞানী ধার্মিকতাকে অন্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি নৈতিক আচরণ, অনুশাসন লংঘনের শাস্তি, ইত্যাদি সম্পর্কিত মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেন। এখানে বিপদটি হলো যে, একজন সামাজিক বিজ্ঞানী নিজেও এ ধরণের বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। যদি সামাজিক বিজ্ঞানী সেই সব বিশ্বাসমুক্ত না হয়ে গবেষণা করে থাকেন, তবে তা পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেতে হলে প্রচলিত ধারণা এবং বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে তুলনা (Comparison between Science and Social Science)

বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড প্রায়শঃ আবেগ, ত্রুটি এবং কখনো যুক্তিহীনতা দ্বারা নির্দেশিত হলেও বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড অন্যান্য কর্মকান্ড থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনন্য।

যদিও শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আমাদের সাথে বিদ্যমান এবং এ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ের উপর সীমাহীন সংখ্যক পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানী নয় এমন ব্যক্তি এবং শিক্ষানবীশ বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও বিষয়টি হেঁয়ালীপূর্ণ রয়ে গেছে। বিজ্ঞান কখনো রহস্যজনক, আবার কখনো পবিত্র আচার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। বিজ্ঞান পদটির প্রকৃত অর্থটি বোঝা সবসময়ই খন্ডিত থেকে গেছে। বিজ্ঞান কোন রহস্যজনক বা পবিত্র আচার চর্চা নয়। অন্যান্য মানব কর্মকান্ডের মত বিজ্ঞান চর্চা হলো আদর্শ এবং সম্ভাব্য বাস্তবতার মধ্যে একটি সমন্বয়। বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড প্রায়শঃ আবেগ, ত্রুটি এবং কখনো যুক্তিহীনতা দ্বারা নির্দেশিত হলেও বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড অন্যান্য কর্মকান্ড থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনন্য।

বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সাথে পদ্ধতিকে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতাটি মূলতঃ প্রধান সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কারণ, অনেকে মনে করেন যে, বিজ্ঞানের মর্যাদা পেতে হলে বিজ্ঞাসম্মত বিষয়বস্তু নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রশ্ন হলো যে, এ ধরণের বিষয়বস্তুগুলো কি? বিজ্ঞানের নিজস্ব বিষয়বস্তু রয়েছে কি? অনু, পরমাণু, প্রাণ-কোষ, ইত্যাদির মতো কিছু বিষয়ের উলে- খ করা গেলেও এটি নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। কারণ, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে অধ্যয়নকৃত যে কোন বিষয়বস্তুই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে যা নিশ্চিত করে বলা যাবে তা হলো, সব বিষয়ের অধ্যয়নই বিজ্ঞান নয়। যেমন, গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতিষতত্ত্ব উভয়েই অধ্যয়ন করে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা পায়, অথচ জ্যোতিষতত্ত্ব পায় না। জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ও মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে অধ্যয়ন করে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে। জ্যোতিষতত্ত্বের এ সকল কর্মকান্ড সম্বলিত জ্ঞানের এই শাখা বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হয় না। যে

কারণে জ্যোতিষতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, সেটি হলো এর বিষয়বস্তু অধ্যয়নে ব্যবহৃত পদ্ধতি, বিষয়বস্তু নয়।

এ ছাড়াও, বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয়বস্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত কোন জ্ঞান এ মূহুর্তে বৈজ্ঞানিক মনে হলেও ভবিষ্যতে তা অবৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত হতে পারে। জ্ঞানের কোন সাধারণ বা বিশেষ বিষয়বস্তুর জন্য নয়, বিজ্ঞান এর পদ্ধতির জন্যই অনন্য। অতএব, সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা, এ বিতর্কটি অধীত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা না করে পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে সমাধানটি সহজ হয়ে যায়। কোন প্রান্তিক বিতর্কে না গিয়ে দু'ধরণের বিজ্ঞানের মধ্যে মিল ও অমিলগুলোকে পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর ফলাফলগুলো বিবেচনা করা উচিৎ। যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সব বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি সূক্ষ্মতার সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে, তার প্রয়োজনও হয় না, তবুও সামাজিক বিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত মর্যাদাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, আমরা আগেই উলে- খ করেছি যে, বিজ্ঞানের মর্যাদা তার পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, বিষয়বস্তু দ্বারা নয়। সামাজিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই এবং ভবিষ্যদ্বাণীকরণের সকল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিই পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই এবং ভবিষ্যদ্বাণীকরণের সকল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিই পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়।

সারাংশ

এই পাঠে বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের যথাযর্থতা নির্ভর করে তার পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে নয়। অর্থাৎ, যে কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা মানেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, বরং কোন পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে গবেষিত বিষয়টির বৈজ্ঞানিক মর্যাদা। সামাজিক বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যটি হলো, সামাজিক আচরণকে যৌক্তিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করা। একজন সমাজ গবেষকের কাজকে তখনই বিজ্ঞানের মর্যাদা দেয়া হবে, যখন দেখা যাবে যে, সামাজিক বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে তার গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। বিজ্ঞানীরা _____ ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে থাকেন।

ক. এক-কারণ
খ. দু'-কারণ
গ. বহু-কারণ
ঘ. সব কারণ

২। বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের ভিন্নতা ঘটে থাকে:

ক. উপাত্তের ধরণের ক্ষেত্রে
খ. কার্যকর সংজ্ঞা ও পরিমাপের ক্ষেত্রে
গ. উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে
ঘ. কার্যকর উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

৩। সামাজিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেতে হলে:

ক. প্রচলিত ধারণাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে
খ. প্রচলিত ধারণাকে গবেষণা রিপোর্টে প্রকাশ করতে হবে
গ. প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছাতে হবে
ঘ. প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পরীক্ষাযোগ্য' – ব্যাখ্যা করুন।

২। 'সামাজিক বিজ্ঞান পরির্বতনের জন্য উন্মুক্ত' – ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। সামাজিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ - ৬

গবেষণা প্রক্রিয়া
Research Process

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- গবেষণা প্রক্রিয়া কী
- গবেষণা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ
- গবেষণা প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

গবেষণা প্রক্রিয়া কী (What is Research Process)?

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, গবেষণা প্রক্রিয়া হলো এমন কিছু কর্মকান্ড, যা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেতে সাহায্য করে। উদ্ভূত সমস্যাগুলো কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হতে পারে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নীতি নির্ধারকগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে, কি ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। একটি কর্মসূচী হতে পারে, দ্বারে দ্বারে স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এবং অন্যটি হতে পারে, সেবা গ্রহীতাকে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা তৈরি হবার কারণ হলো যে, নীতি নির্ধারকদের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে, দু'টি ভিন্ন এলাকায় দু'টি কর্মসূচীকে ভিন্নভাবে পরিচালিত করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারকগণ দিক নির্দেশনা পেতে পারেন। গবেষণা প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন তত্ত্বগত প্রশ্নের সমাধানও অনুসন্ধান করে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, শিল্পায়িত সমাজে কেন আমলাতান্ত্রিকতা এবং পেশাগত বিশেষায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র বৃদ্ধি পায় কি না, এ ধরণের প্রশ্নের সমাধান গবেষণার মাধ্যমেই সঠিকভাবে পাওয়া যায়।

গবেষণার মূল লক্ষ্য একটিই এবং সেটি হলো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে কোন সমস্যাকে সঠিকভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করা।

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলগুলোর প্রচলিত ব্যবহারের অন্তর্নিহিত ধারণাটি গবেষণা পদ্ধতিকে লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সামাজিক সমস্যা সমাধান বা সামাজিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অনুমানগুলোকে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের উপায় হিসাবে গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণা পদ্ধতিকে সামাজিক বিজ্ঞানের পরিধির বাইরেও ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য, নির্বাচনে মতামত জরীপের জন্য, এমন কি, বিশেষ কোন বিষয়ের উপর মতামত যাচাই-এর জন্য। যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হউক না কেন, গবেষণার মূল লক্ষ্য একটিই এবং সেটি হলো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে কোন সমস্যাকে সঠিকভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করা। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অর্জিত হয়। বিজ্ঞানীরা এই অর্জিত জ্ঞানের দাবীকে মূল্যায়নের জন্য যৌক্তিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ যথার্থতার (logical and empirical validity) মানদন্ড দু'টি প্রয়োগ করেন। এই দু'টি মানদন্ডকে যে কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করা হয় সেই কর্মকান্ডসমূহকে গবেষণা প্রক্রিয়া বলে। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, গবেষণা প্রক্রিয়া হলো সেই সকল কর্মকান্ডের একটি সার্বিক পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে বিজ্ঞানী জ্ঞানের অন্বেষায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি আদর্শ রূপ।

গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (Different Stages in a Research Process)

গবেষণা প্রক্রিয়ার সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করতে হয়। গবেষণা প্রক্রিয়ায় যে সুনির্দিষ্ট ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো: গবেষণা সমস্যার নির্বাচন ও

সূত্রবদ্ধকরণ; প্রত্যয়সমূহের কার্যকর সংজ্ঞায়ন ও অনুকল্প নির্মাণ; গবেষণা নক্শা গঠন; পরিমাপ ও উপাত্তসংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ; উপাত্ত সংগ্রহ; উপাত্তের বিশ্লেষণ; এবং উপাত্তের ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণ। এই ধাপগুলোকে ক্রম অনুসারে সাজালে নিম্নোক্ত রূপ নেবে।

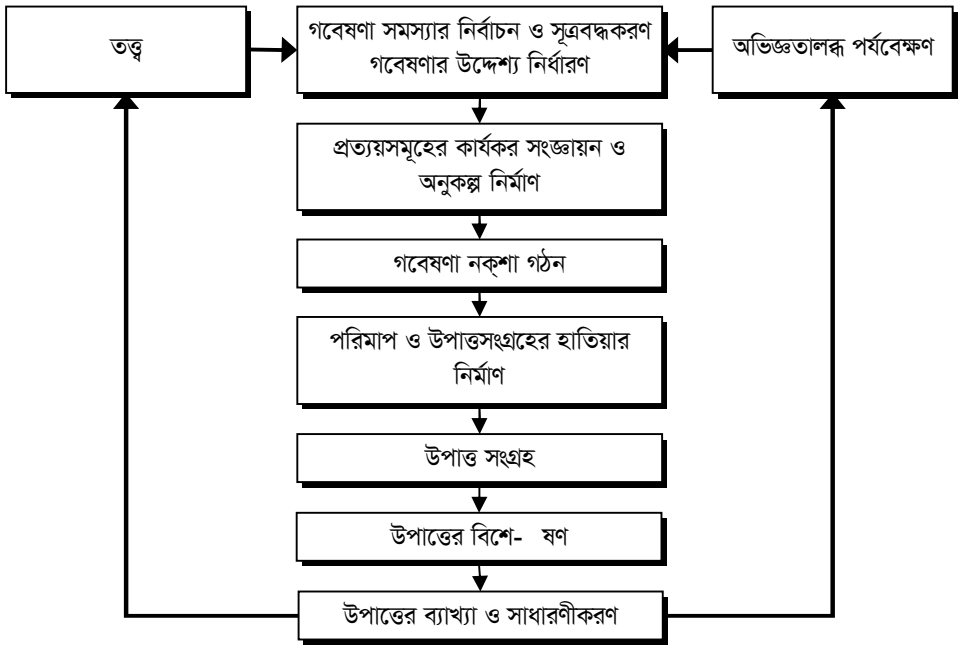

চিত্র ১: গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ

গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ পারস্পরিকভাবে একটির উপর আরেকটি নির্ভরশীল। যেমন, উপাত্ত সংগ্রহ করার পূর্বে যেমন উপাত্ত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, তেমনি গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা না থাকলে উপযোগী অনুকল্প গঠন করা সম্ভব হবে না এবং যথাযথ উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে না। একইভাবে, যদি উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও কৌশল আগে থেকে নির্ধারণ করা না হয়, তবে যথাযথ গবেষণা নক্শা গঠন করা যাবে না, বা উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ করা যাবে না। অপর্যাপ্ত নমুনা নির্বাচন বা অপরীক্ষাযোগ্য অনুকল্প নির্মাণের মাধ্যমে একজন গবেষক তার গবেষণার জন্য অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করতে পারেন।

যদি গবেষণাটি ব্যাখ্যামূলক না হয়ে বর্ণনামূলক হয়, তবে গবেষণা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে অনুকল্প নির্মাণের কোন প্রয়োজন হবে না।

সাধারণভাবে, এই ধাপগুলো এড়িয়ে একটি গবেষণা প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা যায় না। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক গবেষণার প্রকৃতি, প্রেক্ষাপট, সময় ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতার কারণে এই ধাপগুলোর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন, যদি গবেষণাটি ব্যাখ্যামূলক না হয়ে বর্ণনামূলক হয়, তবে গবেষণা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে অনুকল্প নির্মাণের কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ, বর্ণনামূলক গবেষণায় অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণীকরণের মাধ্যমে অনুকল্প নির্মাণ করা হয় ভবিষ্যৎ গবেষণায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য। একমাত্র ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় অনুকল্প পরীক্ষা করা হয়। গবেষণার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, গবেষণা প্রক্রিয়ার ধাপগুলোকে আরো বিস্তারিতভাবে সাজানো যেতে পারে। যদিও পুরো গ্রন্থটিতে এই ধাপগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবুও একটি ধারণা দেবার জন্য গবেষণা প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

গবেষণা সমস্যার নির্বাচন ও সূত্রবদ্ধকরণ (Selection and Formulation of Research Problem): একটি গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষককে প্রথমেই গবেষণাযোগ্য একটি সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। গবেষণা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কোন তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা থেকে, বা কোন সামাজিক সমস্যা থেকে। কিন্তু তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা বা সামাজিক সমস্যাগুলো এত ব্যাপক এবং সাধারণ হয়ে

থাকে যে, গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করা গবেষকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই সমস্যাটিকে (সেটি তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক, যাই হোক না কেন) গবেষণাযোগ্য করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে তীক্ষ্ম করে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে, অতীতে পরিচালিত গবেষণা বা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্বলিত বই পুস্তক পর্যালোচনা করতে হবে। এর ফলে, গবেষক যে বিষয়ে গবেষণার জন্য আগ্রহী, সে বিষয়ের উপর বিদ্যমান জ্ঞানের একটি সংশ্লেষ তৈরি হয়, বিদ্যমান জ্ঞানের মধ্যে কি কি ফাঁক রয়েছে তা ধরা পড়ে এবং বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণাযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, একজন গবেষক 'সংঘাত' বিষয়ে গবেষণা করতে চান। কিন্তু সমস্যা হলো, সংঘাত বিষয়টি এত ব্যাপক যে, এ বিষয়ে সরাসরি গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। সংঘাত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন, রাজনৈতিক সংঘাত, সামাজিক সংঘাত, জাতিসত্ত্বাভিত্তিক সংঘাত, অর্থনৈতিক সংঘাত, ধর্মীয় সংঘাত, পারিবারিক সংঘাত, ইত্যাদি। গবেষক এর কোনটি নিয়ে গবেষণা করবেন প্রথমে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে। ধরা যাক, গবেষক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি 'পারিবারিক সংঘাত' নিয়ে গবেষণা করবেন। কিন্তু পারিবারিক সংঘাতেরও অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, দু'টি পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক সংঘাত, একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সংঘাত, পিতার সাথে পুত্রের বা কন্যার সংঘাত, স্ত্রীর সাথে স্বামীর সংঘাত, নারীর সাথে পুরুষের সংঘাত, ইত্যাদি। সেখানেও গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি পারিবারিক সংঘাতের কোন দিকটি নিয়ে গবেষণা করতে চান। এরপর তিনি দেখবেন যে, সেই বিষয়ের উপর কি কি ধরণের গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, সেই গবেষণাগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোন সমস্যা রয়েছে কি না, গবেষণাগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তত্ত্বের কোন অসংগতি রয়েছে কি না। এ সব কর্মকান্ড পরিচালনার পরই কেবলমাত্র একজন গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারবেন। যখন গবেষক তার সুনির্দিষ্ট গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে ফেললেন তখনই তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, গবেষণাকে একটি সঠিক নির্দেশনা দেয়া গিয়েছে।

যখন গবেষক তার সুনির্দিষ্ট গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে ফেললেন, তখনই তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, গবেষণাকে একটি সঠিক নির্দেশনা দেয়া গিয়েছে।

প্রত্যয়সমূহের কার্যকর সংজ্ঞায়ন ও অনুকল্প নির্মাণ (Operationalization of Concepts and Derivation of Hypothesis): গবেষণার সমস্যা নির্বাচন, গবেষণাযোগ্যকরণ এবং গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পর প্রথমে যে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়, সেটি হলো তাত্ত্বিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে কি কি প্রত্যয় রয়েছে এবং প্রত্যয়গুলোর মধ্যে কি কি সম্পর্কের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা। এগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে যথাযথ অনুকল্প গঠন করা যাবে না। শুধু প্রত্যয়গুলোকে চিহ্নিত করলেই হবে না, সেগুলোর কার্যকর সংজ্ঞায়ন করতে হবে। কারণ, কিছু কিছু প্রত্যয় চলকের আকারে সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য হলেও সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ প্রত্যয় বিমূর্ত, সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। এ রকম বহু প্রত্যয়ের উলে- খ করা যেতে পারে। যেমন, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা, শ্রেণী, সংঘাত, অনুভূতি, রক্ষণশীলতা, সচেতনতা, ক্ষমতা, ইত্যাদি। এই প্রত্যয়গুলোকে কি কি চলকের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায়, তা চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই চলকগুলোকে সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য সূচকের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এরপর প্রতিটি সূচকের জন্য একটি করে আপাতঃস্থিরকৃত বক্তব্য (tentative statement) গঠন করতে হবে, গবেষক যার যথার্থতা প্রমাণ করতে চান তার গবেষণার মাধ্যমে। এই আপাতঃস্থিরকৃত বক্তব্যগুলোই হলো গবেষণার অনুকল্প। এই অনুকল্পগুলো বিভিন্ন প্রস্তাবনার মাধ্যমে বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। অন্য কথায়, গবেষক এখন নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাকে কি করতে হবে।

গবেষণা নক্শা (Research Design): গবেষণা নক্শায়, মূলতঃ পদ্ধতিগত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রথমতঃ, যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত পুরো সমগ্রককে বিবেচনায় আনতে হবে। যদি সমগ্রকটি ক্ষুদ্র হয়, সে ক্ষেত্রে পুরো সমগ্রক নিয়ে গবেষণা কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমগ্রকটি বেশ বড় আকারের হয়ে থাকে। ফলে, সময় এবং সম্পদের অপ্রতুলতা থাকার কারণে পুরো সমগ্রককে নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে, গবেষককে সেই সমগ্রকের একটি অংশ নির্বাচনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করতে হয়। অন্য কথায়, গবেষণার জন্য নির্ধারিত সমগ্রকের একটি বিবরণ

গবেষণা নক্শায়, মূলতঃ পদ্ধতিগত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

দিয়ে সেই সমগ্রককে প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি নির্দিষ্ট অংশ বা নমুনাকে নির্বাচন করতে হয়। অংশ বা নমুনা নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াকে নমুনায়ন বলা হয়। নমুনায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কি ধরণের নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সেটি গবেষণার উদ্দেশ্য এবং সমগ্রকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। নির্বাচিত নমুনায়ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা, নমুনার আকার নির্ধারণসহ এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে গবেষণা নক্শায়। উপাত্ত সংগ্রহের কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং উপাত্ত বিশ্লেষণের কি কি কৌশল ব্যবহার করা হবে, তাও এ পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে উলে- খ করতে হবে। গবেষণায় কোন অনুকল্প পরীক্ষা করা হবে কি না, করা হলে অনুকল্প পরীক্ষার কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, তাও গবেষককে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে শব্দ চয়ন, প্রশ্নের ক্রমধারা,প্রশ্নের সংবেদনশীলতা ও সঙ্গতি বজায় থাকছে কি না, ইত্যাদি বিষয়গুলো গবেষককে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিমাপ ও উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ (Measurment and Construction of Data Collection Instrument): নমুনা নির্বাচনের পর গবেষক স্বভাবতই উপাত্ত সংগ্রহের কথা ভাববেন। কিন্তু উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, উপাত্ত সংগ্রহের কোন পদ্ধতিটি তিনি ব্যবহার করবেন। কারণ, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির উপর নির্ভর করবে উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারটি কেমন হবে। অর্থাৎ, উপাত্ত কি নমুনায় নির্বাচিত উপাদান বা উত্তরদাতার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে, না কি উত্তরদাতার কাছে প্রশ্ন পাঠিয়ে সংগ্রহ করা হবে? উপাত্ত সংগ্রহের উপায় হিসাবে সুসংগঠিত প্রশ্নমালা (structured questionnaire) ব্যবহার করা হবে, না কি অসংগঠিত সাক্ষাৎকার নির্দেশনামা (Interview Guide) ব্যবহার করা হবে? যদি সুসংগঠিত কাঠামোভিত্তিক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো কি উন্মুক্ত থাকবে, বন্ধ প্রকৃতির থাকবে, না দু'ধরণেরই মিশ্রণ থাকবে, সে সম্পর্কেও গবেষককে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যয়ের পরিমাপ প্রক্রিয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর গবেষক উত্তরদাতার কাছে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কি কি প্রশ্ন তিনি করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে সবসময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি যা জানতে চান তা বেরিয়ে আসবে কি না। প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে শব্দ চয়ন, প্রশ্নের ক্রমধারা, প্রশ্নের সংবেদনশীলতা ও সঙ্গতি বজায় থাকছে কি না, ইত্যাদি বিষয়গুলো গবেষককে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ (Data Collection): আমরা পূর্বেই উলে- খ করেছি যে, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি গবেষক সিদ্ধান্ত নেন যে, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তিনি তার উপাত্ত সংগ্রহ করবেন, সে ক্ষেত্রে যোগ্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করতে না পারলে গবেষণার পুরো উদ্দেশ্যটি ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে। সে জন্য গবেষক কি প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নির্বাচন করবেন, কিভাবে তিনি তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন এবং মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের পুরো প্রক্রিয়াটি কার্যকর করবেন, এ সবের বিস্তারিত বর্ণনা এ পর্যায়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাৎক্ষণিকভাবে পূরণকৃত প্রশ্নমালা সম্পাদনার ব্যবস্থার কথাও উলে- খ থাকতে হবে।

উপাত্তের মধ্যে ভুল ত্রুটি যাচাই করে সেগুলোকে চলকের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, এমন সংখ্যাতাত্ত্বিক সংকেত বা প্রতীকে রূপান্ড়রিত করতে হয়।

উপাত্তের বিশ্লেষণ (Analysis of Data): উপাত্ত সংগ্রহের পর গবেষণা নক্শায় নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগৃহীত উপাত্তের সম্পাদনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার কাজটি গবেষকের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। উপাত্তের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিষয়টি গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। কারণ, সংগৃহীত উপাত্তরাশি নিজে থেকে কোন অর্থ বহন করে না, যদি না সেগুলো থেকে গবেষণার শুরুতে স্থিরকৃত প্রশ্নগুলোর উত্তর সুসংবদ্ধভাবে বের করে আনা যায়। বিশ্লেষণের পূর্বে উপাত্তকে প্রাক্রিয়াকরণ করতে হয়। অর্থাৎ, উপাত্তের মধ্যে ভুল ত্রুটি যাচাই করে সেগুলোকে চলকের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, এমন সংখ্যাতাত্ত্বিক সংকেত বা প্রতীকে রূপান্তরিত করতে হয়। তারপর সেগুলোকে কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উপাত্তকে সংক্ষিপ্তকরণের পর কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিস্তৃতি, সহসম্পর্ক, ইত্যাদি পরিমাপগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করতে হবে। যদি উপাত্ত বিশ্লেষণের পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার মধ্যে কার্য-কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে বহুচলক বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক কৌশলগুলো প্রয়োগের উলে- খ করতে হবে।

উপাত্তের ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণ (Interpretation of Data and Generalization): গবেষণা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে এসে গবেষকের সামনে যে কাজটি থাকে, সেটি হলো বিশ্লেষিত উপাত্তের ব্যাখ্যা এবং উপসংহারমূলক সাধারণীকরণ করা। যদি অনুকল্পের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন না হয়, তবে যে তত্ত্ব থেকে অনুকল্পগুলো আহরণ করা হয়েছে, সেই তত্ত্বগুলো সমর্থনযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। অন্যথায়, তত্ত্বের সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি গবেষণাটি কোন অনুকল্প ছাড়া শুরু করা হয়, সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের গবেষণায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফলাফলের সাধারণীকরণগুলো থেকে কিছু অনুকল্প আহরণ করা যেতে পারে।

গবেষণা প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Research Process)

একটি গবেষণা প্রক্রিয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সেগুলো হলো: বৃত্তাবর্ত, পূনরাবৃত্তি এবং আত্মসংশোধন। এই উপাদানগুলোকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

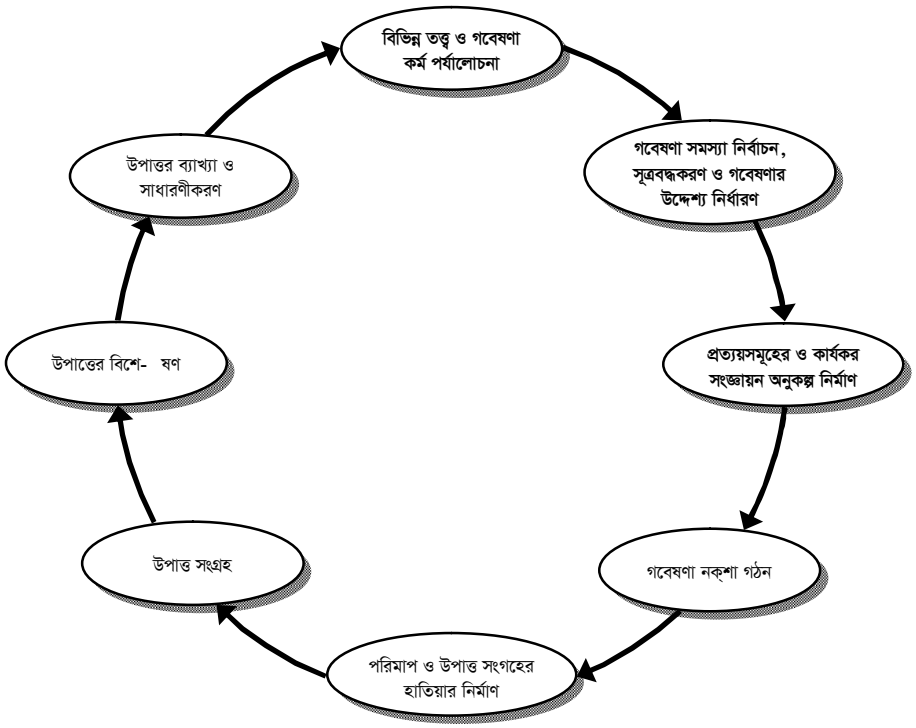

চিত্র ২: গবেষণার বৃত্তাবর্ত

বৃত্তাবর্ত (Circularity): গবেষণা প্রক্রিয়া হলো একটি বৃত্তাবর্তের মত। চিত্র ২-এ আমরা দেখতে পাই যে, একজন গবেষক তার গবেষণা প্রক্রিয়া শুরু করেন বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে এবং শেষ করেন সংগৃহীত তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সাধারণীকরণমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মাধ্যমে। কিন্তু গবেষণা প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এখানেই ঘটে না। যদি গবেষণাটি সফল না হয়, বা আংশিকভাবে সফল হয়, তখন গবেষক পূর্ববর্তী যে কোন ধাপে গিয়ে পুনরায় গবেষণাটি শুরু করতে পারেন। কোন ধাপে গিয়ে গবেষক পুনরায় গবেষণা প্রক্রিয়াটি শুরু করবেন, সেটি নির্ভর করবে কোন পর্যায়ে গিয়ে গবেষণাটি অসফল হয়েছে তার উপর। যেমন, যদি দেখা যায় যে, সংগৃহীত উপাত্ত তৃতীয় ধাপে প্রস্তাবিত অনুকল্পগুলোকে সমর্থন করে নি, তবে তিনি তৃতীয় ধাপে ফিরে গিয়ে বিশেষ কোন অনুকল্প বা সব অনুকল্পকে সংশোধন করবেন এবং গবেষণা প্রক্রিয়ার তৃতীয় থেকে অষ্টম ধাপ পর্যন্ত পুনরায় পরিচালনা করবেন। যদি দেখা যায় যে, অনুকল্পের মধ্যে

কোন সমস্যা নেই, সমস্যাটি হয়েছে স্বল্প সংখ্যক নমুনা নির্বাচনের কারণে চতুর্থ ধাপে। সে ক্ষেত্রে, গবেষক চতুর্থ ধাপে গিয়ে সেই সমস্যা সংশোধনের মাধ্যমে পুনরায় তার গবেষণা প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে পারেন।

পূনরাবৃত্তি (Replication): যদি গবেষণা কর্মটি সফল বলে ধরে নেয়া হয় এবং সপ্তম ধাপের সাধারণীকরণগুলো দ্বিতীয় ধাপে গৃহীত অনুকল্পগুলোকে সত্য বলে প্রমাণ করে, তারপরও গবেষণা কর্মটিকে পুনরায় পরিচালনার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো কোন দৈব ঘটনা নয়। যদি গবেষণাটি একটি ভিন্ন নমুনার উপর পরিচালনা করে পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা যায়, তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের যুক্তিগুলোর স্বপক্ষে আরো জোর সমর্থন পাওয়া যায়।

গবেষণা প্রক্রিয়া হলো আত্মসংশোধনমূলক। বিজ্ঞান তার সাধারণীকরণগুলোকে সবসময় আপাতঃস্থিরকৃত বলে ধরে নেন, চূড়ান্তভাবে নয়।

আত্মসংশোধন (Selfcorrection): গবেষণা প্রক্রিয়া হলো আত্মসংশোধনমূলক। বিজ্ঞান তার সাধারণীকরণগুলোকে সবসময় আপাতঃস্থিরকৃত (tentative) বলে ধরে নেন, চূড়ান্তভাবে নয়। গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে এই আপাতঃস্থিরকৃত সাধারণীকরণগুলো বা অনুকল্পগুলোকে বিজ্ঞানী যৌক্তিকভাবে এবং অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পরীক্ষা করেন। যদি সাধারণীকরণগুলো প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন বিজ্ঞানী নতুন অনুকল্প নির্মাণ করেন এবং সেগুলোকে পরীক্ষা করেন। পূনঃনির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানী তার গবেষণা কর্মকান্ডগুলোকে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পান। কারণ, গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি হবার কারণে একটি আপাতঃস্থিরকৃত সাধারণীকরণ প্রত্যাখ্যাত হতে পারে । যেমন, অর্থনৈতিক মন্দার সময় বিভিন্ন খাতে ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায় বলে গবেষক যে সাধারণীকরণ করেছেন, তার যথার্থতা যদি যৌক্তিকভাবে এবং অভিজ্ঞতালব্ধভাবে প্রমাণ করা না যায়, তবে সাধারণীকরণটি প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু কখনো কখনো যথার্থতা ও যাচাই-এর পদ্ধতির (যেমন, নমুনায়ন, পদ্ধতি, পরিমাপ, উপাত্ত বিশ্লেষণ, ইত্যাদি) মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে একটি সত্য সাধারণীকরণও প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। সত্য সাধারণীকরণকে প্রত্যাখ্যান করার ঝুঁকিকে কমানোর জন্য গবেষক নতুন করে সাধারণীকরণের পূর্বে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপকে পর্যালোচনা করে দেখেন, যা গবেষণা প্রক্রিয়াকে একটি আত্মসংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরিণত করে।

সবশেষে বলা যায় যে, গবেষণা প্রক্রিয়াকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা হলো একটি আদর্শ রূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, একটি গবেষণা প্রক্রিয়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়। যেমন, গবেষণা কখনো তাড়াহুড়ো করে হয়, আবার অনেক সময় খুব ধীর গতিতে হয়; কখনো উচ্চ মাত্রার সূক্ষ্মতা ও আনুষ্ঠানিকতার সাথে, আবার কখনো অসচেতনভাবে এবং খুবই নৈমিত্তিকভাবে করা হয়; কখনো বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের বা ব্যক্তির (যেমন, পদ্ধতিবিদ, বিশেষজ্ঞ, প্রকল্প পরিচালক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী, ইত্যাদি) সমন্বয়ে আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, আবার কখনো এককভাবে এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করা হয়। অতএব, মূল কথাটি হলো, গবেষণা প্রক্রিয়াকে কোন কঠোর নিয়মানুবর্তিকা হিসাবে নয়, বরং এটিকে একটি দিক নির্দেশনা হিসাবে দেখা প্রয়োজন।

সারাংশ

এই পাঠে একটি গবেষণা পরিচালিত করতে গিয়ে যে ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, যে কোন গবেষণাই একটি নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলে। গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যা নির্বাচন এবং এর পরই নির্বাচিত সমস্যার সংজ্ঞা দেয়া, অনুকল্প নির্মাণ করা, অনুকল্প এবং সমস্যা অনুযায়ী গবেষণা নক্শা তৈরি করা, তথ্য সংগ্রহ এবং শেষ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সাধারণীকরণ ও পরবর্তী গবেষণার বিষয়বস্তু সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করা। এই প্রক্রিয়াটিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে গবেষককে অবশ্যই সমস্যার প্রকৃতি, গুরুত্ব এবং এর গভীরতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। অনুকল্প পরীক্ষা করা হয় একমাত্র:

ক. ব্যাখ্যামূলক গবেষণায়
খ. বর্ণনামূলক গবেষণায়
গ. প্রচারণামূলক গবেষণায়
ঘ. প্রয়োগমূলক গবেষণায়।

২। গবেষণা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে:

ক. সামাজিক সমস্যা থেকে
খ. সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে
গ. তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা থেকে
ঘ. উপরের সব।

৩। গবেষণায় কোন ধরণের নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে:

ক. গবেষণার উদ্দেশ্য এবং সমগ্রকের সংখ্যার উপর
খ. গবেষণার উদ্দেশ্য এবং সমগ্রকের প্রকৃতির উপর
গ. গবেষণার স্থান এবং সময়ের উপর
ঘ. গবেষণার স্থান এবং সমগ্রকের সংখ্যার উপর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণা নক্শা কী?

২। উপাত্তের বিশ্লেষণ গবেষণার কোন পর্যায়ে পড়ে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। একটি উদাহরণসহ গবেষণার ধাপগুলো পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৭

সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতার বিষয়
Ethical Issues in Social Research

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতার বিষয়গুলো কী
- নৈতিকতা বিবেচনায় দু'টি অধিকারের দ্বন্দ্ব
- কিভাবে নৈতিক থাকা যায়
- জ্ঞাপিত সম্মতি
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতার বিষয়গুলো কী (What are the Ethical Issues in Social Research)?

আভিধানিক অর্থে, গবেষণায় নৈতিকতার অর্থ হলো, পেশাগত অনুশীলনের গ্রহণযোগ্য নীতিমালাগুলোকে মেনে চলা।

আভিধানিক অর্থে, গবেষণায় নৈতিকতার অর্থ হলো, পেশাগত অনুশীলনের গ্রহণযোগ্য নীতিমালাগুলোকে মেনে চলা। যদিও এই মেনে চলার বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে সামাজিক গবেষকদের জানা এবং এগুলো মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে, কিন্তু লিখিতভাবে এসব বিষয়ে প্রমিতকরণ এবং মানদন্ডভিত্তিক ব্যাখ্যা ও সাংকেতিকীকরণ করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে। গবেষণায় নৈতিকতার নীতিমালাগুলো নিয়ে গবেষকদের মধ্যে একটি সাধারণ সমঝোতা থাকলেও নৈতিকতার প্রমিতকরণের বিষয়ে শব্দ ব্যবহার এবং যে সকল ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে কি করণীয় হবে তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। যেমন, আমরা জানি যে, একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের যেমন জানবার অধিকার রয়েছে, অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠের তেমন গোপনীয়তা রক্ষারও অধিকার রয়েছে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে নৈতিকতার অনুশীলনে কি ধরণের নীতিমালা অনুসরণ করা হবে, তা নিয়ে গবেষকরা একমত হতে পারেন নি।

এটি সাধারণভাবে সবাই মেনে নিয়েছেন যে, গবেষণা করতে গিয়ে কারো ক্ষতি করা গবেষকের জন্য অনৈতিক, বিশেষ করে যদি কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তা পরিচালিত হয়। এটি হতে পারে, একজন উত্তরদাতাকে গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানিয়ে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া, বা এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যা তাকে মারাত্মকভাবে লজ্জিত করতে পারে, বা তার কোন অসুখকর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলা, বা তার অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলা, অথবা তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা। গোপনীয়তার শর্তকে লঙ্ঘন করা বা উত্তরদাতার অজ্ঞাতসারে গবেষণা পরিচালনা করাও উত্তরদাতাকে আহত করতে পারে। উপাত্তের ভ্রান্ত উপস্থাপন, ফলাফলের মিথ্যা বর্ণনা, প্রেক্ষাপটের অতিরিক্ত তথ্যের উপস্থাপন, বা আংশিকভাবে তথ্য প্রকাশ করার মাধ্যমেও একজন গবেষক অনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন।

সাধারণভাবে, গবেষকগণ নৈতিকতা বজায় রাখতে চান। কারণ, যদি কোন গবেষক অনৈতিক বলে পরিচিত হয়ে উঠেন, তাহলে দেখা যাবে যে, তিনি গবেষণার জন্যে আর কোন আর্থিক সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা পাবেন না এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদেরও কোন সহযোগিতা পাবেন না। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নির্ধারিত অনুকল্পগুলোকে সমর্থন না করলে, নৈতিকতার মানদন্ডকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে কখনো কখনো গবেষক তার প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে দ্ব্যর্থবোধক উক্তির মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির দিকে প্রলুব্ধ হতে পারেন। এটি অনেকটা সরকারী অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ধার নেবার মতো। যিনি অর্থটি ধার করছেন তিনি মনে মনে ভাবেন যে, যখন তার হাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সমাগম হবে, তখন তিনি তা ফেরত দিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি গবেষণায় এ ধরণের

মিথ্যাচরণ ধরা পড়ে, তবে তার প্রতিক্রিয়াটি হয় প্রচন্ড। উপাত্ত নিয়ে মিথ্যাচরণের ঘটনা বহু ঘটেছে এবং সে সকল গবেষক তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও পেয়েছেন।

কেন একজন বেপরোয়া গবেষক উপাত্তের মিথ্যাচরণ করেন বা উত্তরদাতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে গবেষণা পরিচালনা করেন? এই প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে গেলে গবেষণার একটি পরিহাসমূলক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, যা সাধারণতঃ এমন সব সমস্যা নিয়ে তৈরি হয়, যা থেকে আমরা সবসময় পরিত্রাণ পেতে চাই। যেমন, একজন ব্যক্তি সুস্থ কেন, বা একজন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে না কেন, আমরা তা নিয়ে গবেষণা করি না, বরং একজন মানুষ কেন অসুস্থ হয়, বা কেন আত্মহত্যা করে সেটি জানার জন্যই আগ্রহী হই। এখানেই দ্বন্দ্বটির শুরু। কারণ, আমরা জানি যে, অসুস্থতা বা আত্মহত্যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ সকল ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে আমরা গবেষণা করতে চাই, এ সকল সমস্যাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে সে সব সমস্যা সমাধানের একটি পথ নির্দেশের জন্য। যেমন, কোন রোগের প্রতিষেধক পাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রথমে সেই রোগের কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। যখন কোন কারণকে অনুমান করা হয়, তখন তার অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, এটি প্রমাণের জন্য গবেষণাধীন ব্যক্তি বা বিষয়কে সেই রোগে আক্রান্ত হতে হবে। অন্য কথায়, একজন সুস্থ মানুষের শরীরে সেই রোগের জীবানু প্রবেশ করিয়ে দেখা যেতে পারে যে, সেই ব্যক্তির শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটুকু কার্যকর, রোগটি কিভাবে ছড়াচ্ছে এবং প্রতিষেধকটি কিভাবে কাজ করছে। আপাতঃদৃষ্টিতে, এটি একটি অনৈতিক কাজ মনে হলেও গবেষক যুক্তি দেবেন যে, এটি না করলে যিনি অসুস্থ তার অসুস্থ হবার কারণগুলো তো জানা যাবে না। কেন না সেটি গবেষণার পূর্বেই ঘটে গেছে। কারণ নির্ণয় করতে না পারলে প্রতিষেধক আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তার কারণ যদি জানাই থাকে, তাহলে তো কারণ নির্ণয়ের গবেষণার প্রয়োজন হতো না। রোগের কারণগুলো জানা গেলেই তখন একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে প্রতিষেধকটি কার্যকর হয় কি না তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

নৈতিকতা সম্পর্কে এ ধরণের দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির আরো উলে- খ করা যেতে পারে। যেমন, একজন গবেষক যখন ডাকযোগে একটি প্রশ্নমালা উত্তরদাতার কাছে পাঠান, তখন গবেষক কোন না কোনভাবে উত্তরদাতাকে কিছু না কিছু মূল্য দিতে বাধ্য করেন। যেমন, কিছুটা সময় নেবার মাধ্যমে, বা কিছুটা মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে, বা উত্তরদাতার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে। গবেষক উত্তরদাতাকে কোন সুযোগ সুবিধা না দিয়ে, বরং নিজে কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকেন অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় করে। যদি নৈতিকতার খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, গবেষণা করা আর সম্ভবপর হচ্ছে না। অতএব, গবেষণায় নৈতিকতার বিষয়টি যতটা সহজ বলে মনে হয়, এটি আসলে ততটা সহজ নয়। সামাজিক বিজ্ঞানের পরিধি যত ব্যাপক হয়েছে এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি যতটা সূক্ষ্মতর ও পরিশীলিত হয়েছে, সামাজিক গবেষণা পরিচালনায় নৈতিকতার বিষয় নিয়ে উদ্বেগও ততবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকার, কল্যাণ এবং গবেষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটি পেশায় আলোচনাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলাফল হিসাবে, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সমাজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে আচরণ বিধি পরিগ্রহণ করেছে।

এটি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকার লঙ্ঘন ও অকল্যাণ সাধনের কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ সামাজিক গবেষকের থাকে না, তবুও অনেক সময় তা ঘটে যায়। গবেষণার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সুসংবদ্ধ ও পরীক্ষাযোগ্য জ্ঞানের বিকাশে অবদান রাখা। সুসংবদ্ধ ও পরীক্ষাযোগ্য জ্ঞান উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা যে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন, সেটি হলো গবেষণা প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাশাপাশি গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচিত হয়ে থাকে। নৈতিকতার প্রশ্নটি কত বেশী মূখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা নির্ভর করবে গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি ও গবেষণা পদ্ধতির উপর। যেমন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বুদ্ধনাঙ্ক নির্ণয়, বা কর্মসূচী মূল্যায়ন, ইত্যাদির ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি যতটা সতর্কতার সাথে বিবেচিত হয়, সাধারণ গবেষণার ক্ষেত্রে তা ততটা নিখুঁতভাবে দেখা হয় না।

নৈতিকতার প্রশ্নটি কত বেশী মূখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা নির্ভর করবে গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি ও গবেষণা পদ্ধতির উপর।

যে প্রেক্ষাপটে একটি গবেষণা পরিচালিত হয় সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, ইত্যাদি স্থানে যে পরিস্থিতিতে পরীক্ষণমূলক গোষ্ঠীর উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয় তা অনেক সময় যাদের উপর পরীক্ষাটি পরিচালনা করা হচ্ছে তাদের ক্ষতি করতে পারে। উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির বিষয়টি ক্ষেত্র বিশেষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যারা গবেষণায় অংশগ্রহণ করে তাদের বৈশিষ্ট্যও নৈতিকতার বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, শিশু, মানসিক রোগী, রাজনীতিবিদ, মাদকাশক্ত মানুষ, এইড্স রোগী, ইত্যাদি। সবশেষে, কি ধরণের উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে তাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সংবেদনশীল ও ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৈতিকতার নীতিমালাগুলোকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হয়।

নৈতিকতা বিবেচনায় দু'টি অধিকারের দ্বন্দ্ব (Conflicts of Two Rights in Ethical Consideration)

সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'টি অধিকারের মধ্যে দ্বন্দের সম্মুখীন হন। একটি হলো, গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের অধিকার এবং অন্যটি হলো, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের আত্মমর্যাদা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।

সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'টি অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। একটি হলো, গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের অধিকার এবং অন্যটি হলো, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের আত্মমর্যাদা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে একটি পরিকল্পিত গবেষণা কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত প্রথম অধিকারটিকে খর্ব করে। অন্যদিকে, নৈতিকতার দিক থেকে প্রশ্ন তোলা যায় এমন গবেষণা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় অধিকারকে খর্ব করে। এই দ্বন্দ্ব দু'টিকে কিভাবে সমাধান করা যায় তার কোন সহজ, নির্ভুল বা সঠিক জবাব নেই। সামাজিক গবেষণার মূল্য ও সুফলের প্রতি গবেষকের গুরুত্ব প্রদানের মাত্রা নির্ভর করে তাদের পটভূমি, দৃঢ় প্রত্যয় এবং অভিজ্ঞতার উপর। যেমন, একজন নীতি বিশ্লেষক সবসময় সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণীকরণের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, উদারপন্থিরা সবসময় মানুষের স্বাধীনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও গোপনীয়তার প্রতি সম্ভাব্য সকল প্রকার ঝুঁকি থেকে সতর্ক থাকার উপর জোর দিয়ে থাকেন।

একটি গবেষণা প্রকল্প পরিকল্পনায় গবেষকের বাধ্যবাধকতাটি হলো প্রস্তাবিত গবেষণার সম্ভাব্য সুফল বা অবদান এবং গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি বা মূল্য প্রদানের মধ্যে একটি তুলনামূলক পরিমাপ করে নেয়া।

অতএব, একটি গবেষণা প্রকল্প পরিকল্পনায় গবেষকের বাধ্যবাধকতাটি হলো প্রস্তাবিত গবেষণার সম্ভাব্য সুফল বা অবদান এবং গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি বা মূল্য প্রদানের মধ্যে একটি তুলনামূলক পরিমাপ করে নেয়া। সম্ভাব্য সুফলগুলো হতে পারে তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক জ্ঞানের অগ্রগতি, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ প্রাপ্তি (সেটি আর্থিকও হতে পারে), বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি এবং গবেষণাকৃত বিষয়ের উপর অধিকতর উপলব্ধি অর্জন। ক্ষতির বিষয়গুলি হতে পারে কারো আত্মমর্যাদায় আঘাত করা, উদ্বিগ্ন করে তোলা বা লজ্জিত করা, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করা এবং স্বায়ত্বশাসন বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা। কিন্তু এই তুলনামূলক পরিমাপটি হলো সাধারণভাবে ভাবনিষ্ঠ (subjective) একটি সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানীরা পেশাগত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেন।

কীভাবে নৈতিক থাকা যায় (How to Remain Ethical)?

মানুষের উপর ক্ষতিকর বিষয়গুলো কিভাবে প্রভাব ফেলে এবং ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রভাব কিভাবে এড়ানো যায়, সেগুলো প্রদর্শন করার যদি আমাদের সৎ, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য থাকে, তবে পূর্বে উলি- খিত দ্বন্দ্বমূলক সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের পরিবর্তে পশু প্রাণীর উপর গবেষণা পরিচালনা একটি সাধারণ ব্যাপার। পশু-প্রাণীর উপর কোন ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাবটি সহজেই পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষের পরিবর্তে পশু প্রাণীর ব্যবহার খুব কদাচিৎ দেখা যায়। কারণ, মানুষের পরিবর্তে পশু-প্রাণী ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাটি হলো যে, পশু-প্রাণীর ক্ষেত্রে কোন সামাজিক সম্পর্ক বা বৈশিষ্ট্যের (যেমন, ধর্ম, আয়, শিক্ষা, পেশা, ইত্যাদি) উপস্থিতি থাকে না। তবে, ইদানিং পরীক্ষণমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জীর মত প্রাণীর ব্যবহার শুরু হয়েছে। কেননা, শিম্পাঞ্জীরা ইশারার মাধ্যমে মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। অনেকেই গবেষণায় পশু-প্রাণীর ব্যবহারকেও

সাধারণভাবে অনৈতিক বলে মনে করেন। সামাজিক গবেষণায় পশু-প্রাণীর ব্যবহার একটি অতিরিক্ত সমস্যা তৈরি করে। তা হলো, মানুষের সাথে পশু-প্রাণীর যোগাযোগের উন্নত কৌশল আবিষ্কার মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, অনেকে মনে করেন যে, পশু-প্রাণীর উপর গবেষণা পরিচালনা নৈতিক নয় এবং তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ।

কম্পিউটার অনুকরণের (computer simulation) মাধ্যমে কৃত্রিম পরিস্থিতি তৈরি করে গবেষণা পরিচালনা করা যায়। এমন পরিস্থিতি খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে আগে থেকেই ঋণাত্মক প্রভাবের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং যাতে করে গবেষককে নতুন করে ঋণাত্মক প্রভাবের জন্ম দিতে না হয়। যদি উপরিলি খিত পরিস্থিতির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রভাব সৃষ্টিকারী কারণের সীমিত ব্যবহার বা স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে ঋণাত্মক প্রভাব পড়লেও তা মৃদু পরিমাণে ঘটে। সম্ভাব্য ঋণাত্মক প্রভাবের কথা উত্তরদাতাকে জানিয়ে এবং তাদের অনুমতি নেয়ার মাধ্যমেও গবেষকের নৈতিকতা রক্ষিত হয়। গবেষকের পক্ষে এমন যুক্তি দাঁড় করাতে হবে যে, যাতে করে গবেষণাটি অনৈতিক মনে না হয়। অর্থাৎ, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে তার চেয়ে সুফল বয়ে আনবে বেশী, বা তারা এত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে যে, নতুন করে আর ক্ষতি হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। পুরো জনসংখ্যার পরিবর্তে নমুনার ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে খুব কম সংখ্যক মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়। সমষ্টিগত উপাত্ত প্রকাশের মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করে নৈতিকতা রক্ষার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে হবে। মূল্য বনাম সুফলের প্রেক্ষাপটে নৈতিকতা চর্চার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান কেন্দ্রীয় সমস্যার কথা সবচেয়ে বেশী বিবেচিত হয়ে থাকে। একটি হলো জ্ঞাপিত সম্মতি (informed consent), এবং অন্যটি হলো গোপনীয়তা (privacy)।

জ্ঞাপিত সম্মতি (Informed Consent)

সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে যে, মানুষকে সংশি- ষ্ট করে গবেষণা পরিচালনা করলে তা অংশগ্রহণকারীর জ্ঞাপিত সম্মতির মাধ্যমেই করা উচিৎ।

সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে যে, মানুষকে সংশ্লিষ্ট করে গবেষণা পরিচালনা করলে তা অংশগ্রহণকারীর জ্ঞাপিত সম্মতির মাধ্যমেই করা উচিৎ। যখন গবেষণার বিষয় হিসাবে মানুষের বড় ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে, বা ব্যক্তির অধিকারকে ত্যাগ করতে বলা হয়, তখন জ্ঞাপিত সম্মতি গ্রহণ করা হলো একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই জানতে হবে যে, পুরো গবেষণা প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ স্বেচ্ছামূলক এবং গবেষণা শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণের ফলে তাকে তার সম্ভাব্য, বিপদের ঝুঁকি, অধিকার ও সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হবে। সংজ্ঞা অনুযায়ী, অংগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে যে সব বিষয় প্রভাবিত করতে পারে, সে সব বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবার পর একজন ব্যক্তি কোন গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন কি না, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিটিই হলো জ্ঞাপিত সম্মতি।

জ্ঞাপিত সম্মতির বিষয়টি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আইনগত বিবেচনাবোধ থেকে উদ্ভূত হয়।

জ্ঞাপিত সম্মতির বিষয়টি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আইনগত বিবেচনাবোধ থেকে উদ্ভূত। কোন ব্যক্তি গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে চান কি না, তা তাকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ হলো সেই ব্যক্তির আত্মমর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এতে করে গবেষণায় অংশগ্রহণ করার ফলে সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি বা ঋণাত্মক প্রভাবের দায় দায়িত্বটি আংশিকভাবে অংশগ্রহণকারীর উপরও বর্তায়। সম্মতি গ্রহণের আরেকটি যুক্তি হলো যে, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তার নিজের ভালো মন্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে, সেহেতু সে নিজে তার নিজের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে পছন্দ করবার স্বাধীনতা ভোগ করে। জ্ঞাপিত সম্মতি গবেষককে আইনগত ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখে। কারণ, অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছায় নিজেকে গবেষণা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করে।

জ্ঞাপিত সম্মতির নীতিটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও এর কার্যকর বাস্তবায়নের মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো যে, পরিস্থিতির ভিন্নতায় জ্ঞাপিত সম্মতি বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে ঐকমত্যের অভাব। এ ক্ষেত্রে, যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয় সেগুলো হলো: জ্ঞাপিত অংশগ্রহণকারী কি? কিভাবে আমরা জানি যে, একজন ব্যক্তিকে যে তথ্যগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো তিনি বুঝতে

পেরেছেন? কতটুকু তথ্য দেয়া প্রয়োজন? যদি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারা পরীক্ষণ দলে এবং কারা নিয়ন্ত্রিত দলে রয়েছে এটি তাদের জানতে না দেয়ার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন কি হবে? এ সব প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। তবে সাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে জ্ঞাপিত সম্মতির নীতিমালার উদ্দেশ্য কি, তার ব্যাখ্যা, এর প্রধান উপাদানগুলো কি, তার উলে খ, এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কি, তা আলোচনা করা যেতে পারে। জ্ঞাপিত সম্মতি চারটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্টঃ যোগ্যতা (competence) স্বেচ্ছাপ্রণোদন (voluntarism), পূর্ণ তথ্য (full information), এবং উপলব্ধি (comprehension)। এই উপাদানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

যোগ্যতা (Competence): জ্ঞাপিত সম্মতির নীতিমালাটির অন্তর্নিহিত ধারণাটি হলো যে, একজন দায়িত্বশীল ও পরিপক্ক ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা সঠিক হতে হবে। কিন্তু যেহেতু বহু মানুষ রয়েছে যারা পরিপক্ক ও দায়িত্বশীল নন, সেহেতু সে ধরণের যোগ্য মানুষকে খুঁজে বের করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, যদি একজন ব্যক্তির মানসিক বৈকল্য থাকে, বা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তবে সে ব্যক্তি সম্মতি প্রদানে অক্ষম হবেন। শিশু-কিশোর, গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন বা অচেতন মানুষ এবং মানসিক রোগীদের সম্মতি প্রদানে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। গবেষণা থেকে যখন এ ধরণের অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি কোন সুফল পাবার সম্ভাবনা থাকে (যেমন, থেরাপীমূলক চিকিৎসা), তখন তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক, পিতামাতা এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। যখন সরাসরি সুফল পাবার সম্ভাবনা থাকে না এবং কোন ঋণাত্মক প্রভাবের ঝুঁকি থাকে, তখন অনেকে এ সব ব্যক্তিদের গবেষণায় একেবারে সম্পৃক্ত না করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

স্বেচ্ছাপ্রণোদন (Voluntarism): জ্ঞাপিত সম্মতির নীতিমালা গবেষণায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং কোন ঝুঁকি থাকলে তা মেনে নেয়ার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছাকেও প্রতিশ্রুত করে। কিন্তু যে সব শর্তে একজন ব্যক্তি তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করবেন, তা প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাজ নয়। কোন গবেষণা যখন কারাগার, মানসিক হাসপাতাল, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হয়, তখন সে সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীর স্বাধীনতা ভীষণভাবে প্রভাবিত হতে পারে। যেমন, একজন রোগী যখন একজন চিকিৎসক-গবেষকের অধীনে চিকিৎসাধীন থাকেন, তখন সেই রোগী তার উপর কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য সহজেই সম্মতি দিতে পারেন। কারণ, রোগীটি সেই চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল। এখানে যদিও জ্ঞাপিত সম্মতি পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সম্মতিটি কার্যতঃ স্বাধীন নয়। অতএব, শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীর সম্মতিই নয়, তাকে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। এমন কি, সম্মতি প্রদানের সময় তৃতীয় ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

পূর্ণ তথ্য (Full Information): সম্মতি প্রদান শুধু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেই চলবে না, সম্মতি গ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারীকে গবেষণার বিষয়ে পূর্ণ তথ্য দিতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ জ্ঞাপিত সম্মতি পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, অংশগ্রহণকারীকে পূর্ণ তথ্য দিয়ে সম্মতি পেতে হলে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিস্তারিত তথ্যকে উপস্থাপন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীদের কাছেও সম্পূর্ণ তথ্য থাকে না। যদি সম্পূর্ণ তথ্য বিজ্ঞানীর হাতে থাকতো, তাহলে হয়তো গবেষণাটি পরিচালনার প্রয়োজন হতো না। তার অর্থ এই নয় যে, পূর্ণ জ্ঞাপিত সম্মতির নীতিমালাটি প্রয়োগ করা যায় না। তবে, যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে সম্মতি গ্রহণের কৌশলটি সহজেই প্রয়োগ করা যায়। এই লক্ষ্যে, গবেষকের যা করণীয় তা হলো: গবেষণায় যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং গবেষণার উদ্দেশ্য কি, তার একটি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে; সম্ভাব্য অস্বস্তি, ঋণাত্মক প্রভাব, বা বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হবে; সম্ভাব্য সুফল সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনা দিতে হবে; পদ্ধতি সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; অংশগ্রহণকারীর জন্য সুবিধা হতে পারে এমন বিকল্প পদ্ধতির কথা জানাতে হবে; এবং গবেষণার যে কোন স্তরে অংশগ্রহণকারী তার সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারেন, সে বিষয়ে তাকে অবহিত করতে হবে।

উপলব্ধি (Comprehension): অনেক সময় গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ সত্ত্বেও তা সহজে উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, পদ্ধতিগুলো এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, যা অংশগ্রহণকারী সম্মতি প্রদানের সময় বুঝতে পারেন না। অংশগ্রহণকারী যাতে এ সব বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন, সে জন্য প্রয়োজনবোধে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত অংশগ্রহণকারীকে গবেষণায় সম্পৃক্ত করতে হবে, অংশগ্রহণকারীকে গবেষণাটি সম্পর্কে বোঝাতে পারেন এমন পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে, অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা এবং সম্মতি প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সময় ক্ষেপণ করে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ দিতে হবে।

গোপনীয়তা (Privacy)

গোপনীয়তা রক্ষা বা লংঘনের বিষয়টি সবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার বলতে বোঝায়, একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং কখন ও কোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তার অধিকার। তার বিশ্বাস, মনোভাব, আচরণ এবং মতামত অন্যের সাথে ভাগাভাগি করবেন, না কি লুকিয়ে রাখবেন, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাও অধিকারের সাথে জড়িত। গোপনীয়তার বিষয়টি তথ্যের স্পর্শকাতরতা, পর্যবেক্ষণের পটভূমি, এবং তথ্যের প্রচার, এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়ে থাকে।

তথ্যের স্পর্শকাতরতা (Sensitivity of Information): যে তথ্য গবেষক সংগ্রহ করছেন তা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে কতটুকু হুমকির সম্মুখীন করে, বা তা তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে, তার উপর নির্ভর করে তথ্যের স্পর্শকাতরতা। কিছু তথ্য রয়েছে, যা অন্য তথ্যের চেয়ে বেশী ব্যক্তিগত এবং সেগুলো ব্যক্তিকে বেশী হুমকির সম্মুখীন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় অনুরাগ, যৌন আচরণ, আয়, জাতি-বর্ণগত সংস্কার, বুদ্ধিমত্তা, সততা, সাহস, ইত্যাদির মত বৈশিষ্ট্য। নাম, পদবী, পেশা, ইত্যাদি অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বেশী স্পর্শকাতর। তথ্য যত বেশী স্পর্শকাতর হবে, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ততবেশী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যে তথ্য গবেষক সংগ্রহ করছেন তা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে কতটুকু হুমকির সম্মুখীন করে, বা তা তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে তার উপর নির্ভর করে তথ্যের স্পর্শকাতরতা।

পর্যবেক্ষণের দৃশ্যপট (Settings Being Observed): গবেষণার দৃশ্যপট একটি গবেষণা থেকে অন্য গবেষণায় ভিন্ন হতে পারে — সেটি হতে পারে খুব গোপনীয়, আবার তা হতে পারে একেবারে প্রকাশ্য। যেমন, অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির বাড়ি হতে পারে সবচেয়ে গোপন স্থান। অতএব, অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব অনুমতি ছাড়া তাদের বাড়িতে প্রবেশ করা নৈতিকতা বিরোধী। যাই হোক, গবেষণার স্থান কতটুকু গোপন বা প্রকাশ্য, তা অনেক সময় নির্ধারণ করা যায় না বলে অনেক গবেষণা নৈতিকতা বিষয়ক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যেমন, আমরা জানি যে, মাদক সেবনকারীরা সাধারণতঃ প্রকাশ্যে মাদক দ্রব্য সেবন করে না। কিন্তু তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য গবেষক যদি মাদক দ্রব্য সরবরাহকারীর ছদ্মবেশে তাদেরকে একটি স্থানে ডেকে এনে আশ্বাস দেন যে, তাদেরকে কেউ পর্যবেক্ষণ করছে না, তবে তারা হয়তো স্বাচ্ছন্দ্যে মাদক দ্রব্য সেবন করতে শুরু করবে। এ ধরণের গবেষণা অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, গবেষক যেভাবে তার গবেষণা কার্য সম্পাদন করেছেন তা প্রতারণার সামিল।

গবেষণার দৃশ্যপট একটি গবেষণা থেকে অন্য গবেষণায় ভিন্ন হতে পারে। সেটি হতে পারে খুব গোপনীয়, আবার তা হতে পারে একেবারে প্রকাশ্য।

তথ্যের প্রচার (Dissemination of Information): গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তথ্যের প্রচার করা। তথ্য প্রচার করতে গিয়ে গবেষককে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অংশগ্রহণকারীর পরিচয় যেন কোনভাবে প্রকাশিত না হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো অংশগ্রহণকারী নিজে তার পরিচয় প্রকাশে সম্মতি দিতে পারেন, বা গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারকে প্রত্যাহার করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে, গবেষককে অবশ্যই জ্ঞাপিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে, প্রদত্ত তথ্য থেকে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় আলাদা করতে হবে, যাতে করে তথ্য প্রদানকারীর সাথে তথ্যকে চিহ্নিত না করা যায়। এটি নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হলো, প্রশ্নমালার মধ্যে উত্তরদাতার নাম না জানতে চেয়ে

একটি চিহ্নিতকরণ নম্বরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। বিশ্লেষণের জন্য তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াকরণের পর চিহ্নিতকরণ নম্বরটিকে আলাদা করে নিলে সহজেই অংশগ্রহণকারীর পরিচয়কে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলা যায়।

সারাংশ

এই পাঠে আমরা গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা আলোচনা করেছি। গবেষণার কাজ শুরুর পূর্বে, যে বিষয়গুলো নৈতিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে সেগুলোকে পরিহার করে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায়, গবেষণাটি অনৈতিক বলে চিহ্নিত হবে। নৈতিকতার বিবেচনায় দু'টি অধিকারের দ্বন্দ রয়েছে। একটি হলো গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের অধিকার এবং অন্যটি হলো, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার। এ দু'টির সমন্বয় ঘটিয়ে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। জ্ঞাপিত সম্মতি ও গোপনীয়তার বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। নৈতিকতার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হলে গবেষককে পূর্ণ তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উত্তরদাতার কাছে গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। শুধু তাই নয়, গবেষককে স্বাধীনভাবে তার মতামত দেয়ার পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। গবেষণায় নৈতিকতা হলো:

ক. গবেষণা কর্মে অপ্রেয়োজনীয় অর্থ খরচ না করা
খ. গবেষণা কর্মে অপ্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ না করা
গ. পেশাগত অনুশীলনের মাধ্যমে তথ্য সারণিবদ্ধকরণ
ঘ. পেশাগত অনুশীলনের গ্রহণযোগ্য নীতিমালাগুলোকে মেনে চলা।

২। গবেষণায় সম্মতি গ্রহণের কৌশল হিসাবে গবেষককে যা করতে হবে:

ক. গবেষককে নিজের পরিচয় দিতে হবে
খ. গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উত্তরদাতাকে একটি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে
গ. গবেষককে তার উপরওয়ালার পরিচয় দিতে হবে
ঘ. উপরের সব।

৩। কিছু তথ্য আছে যা বিশেষভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে হুমকির সৃষ্টি করতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

ক. ধর্মীয় অনুরাগ
খ. বুদ্ধিমত্তা
গ. আয়
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার উপায় কী?

২। গবেষণায় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার কারণ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। জ্ঞাপিত সম্মতি কী? জ্ঞাপিত সম্মতির সাথে জড়িত উপাদানগুলো আলোচনা করুন।